শেক্‌স্‌পীয়র মার্ডার মিস্ট্রি

ধীরু চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স/৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট/কলকাতা ৭০০০৭৩

অগ্রজপ্রতিম

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্য গ্রন্থ

বিখ্যাত মার্ডার কাহিনী

শেকসপীয়র মার্ডার মিস্টি

শেকসপীয়র সম্বন্ধে দুনিয়ার তাবৎ আপামর জনসাধারণের ধারণার ব্যাপারে কিছুমাত্র তারতম্য নেই। আমরা তাঁর জগৎজোড়া খ্যাত নাটকাবলী পড়েছি, মঞ্চে বা ছায়াচিত্রে দেখেছি। মুগ্ধ হয়েছি। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে এসেছে এমন একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাধরের কলমের শক্তির কথা ভেবে।

শেকসপীয়র জাতিতে ইংরেজ কিন্তু দুনিয়ার কোন ভাষাভাষীই সে কথাটা মনে রাখে না। শেকসপীয়র শেকসপীয়রই, তার কোন দেশ নেই, জাত নেই। তিনি কালাকালের ঊর্ধ্বে। তাঁর রচিত নাটকাদির চরিত্র সকল লোকের মুখে মুখে, কিংবদন্তীতে পর্যবসিত।

এবার দেখা যাক এই শেক্সপীয়রের জীবন কেমন ছিল। একে পাঁচ মিনিটের জীবনীও বলা যায় :

* * *

মজা এই, জীবিত থাকাকালীন মানুষটির প্রতি আদৌ কেউ নজর দেয়নি। গ্রাহ্য করেনি মোটে। তারপর, এক সময় তাঁর মৃত্যু হল। এবং মৃত্যুর পর পাক্কা একশ' বছর কেটে গেল। তখনও পর্যন্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত, অখ্যাত অবজ্ঞাত একজন হয়েই তিনি রইলেন। অবশ্য এরপর থেকেই হয় পরিচিতি তথা অসামান্য খ্যাতির শুরু। যার শেষ আজও হয়নি। অর্থাৎ সেই সময় থেকে অদ্যাপি লক্ষ কোটি কথা লিখিত হয়েছে এই অদ্ভুত প্রতিভাধর মানুষটি সম্বন্ধে।

পালকের কলম দিয়ে আক্কেল-দাঁত তীক্ষ্ণ করা এমন আর দ্বিতীয় কোন লেখক আজও এই মর দুনিয়ায় জন্মালো না যাঁর বিষয়ে এত রকম, এত অজস্র মন্তব্য, এত অসংখ্য বাক্যব্যয়, সমালোচনা বা টীকাটিপ্পনীর উদ্ভব হয়েছে!

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর জন্মস্থানে যায় তীর্থযাত্রার সুপবিত্র

মনোভাব নিয়ে। যদি আপনি স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে সবুজ তৃণভূমির ওপর দিয়ে স্যাটারি পর্যন্ত পদচারণা করে যান, তাহলে অবশ্যই আপনার মনে এই কথাটি জাগবে যে এই পথ দিয়েই কয়েকশত বৎসর পূর্বে একজন উদ্ভট ধরনের গ্রাম্য যুবক তাঁর প্রণয়িনী অ্যানি হোয়াটলির সঙ্গে অভিসার কামনায় নির্দিষ্ট একটি স্থানে মিলিত হবার জন্য চঞ্চল চরণে একদা হেঁটে গিয়েছে।

তখন বুঝি উইলিয়াম শেকসপীয়রের কল্পনায়ও ছিল না যে পরবর্তী যুগে তাঁর নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবিশ্বাস্য রকম শ্রদ্ধায়, অতুলনীয় যশোমণ্ডিত হয়ে দিগ্বিদিকে উচ্চারিত হতে থাকবে। আর এও বোধকরি তিনি ভাবতে পারেন নি যে সরল গ্রাম্য কবিতার মতো তাঁ জীবনে ... ঘটনাটি অতীব দুঃখের এক পরিণতি লাভ করবে ... জন্য তাঁকে বছরের পর বছর খেদ করে, পরিতাপ করে ... হবে, এটাও ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে।

অবশ্য শেকসপীয়রের জীবনের করুণতম ট্র্যাজেডি যে ছিল তাঁর বিবাহ ও বিবাহিত জীবনটি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

একথা সত্য যে যদিও তিনি অ্যানি হোয়াটলিকে ভালবাসতেন খুবই, তবু বলতে দ্বিধা নেই যে জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রির গভীরে অপর একটি তরুণীর সঙ্গেও তিনি সবিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা চালিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল। তরুণীর নাম : অ্যানি হ্যাথাওয়ে।

এই দ্বিমুখী প্রণয়েই বিপত্তির শুরু। এখানেই গোলমালের গোড়াপত্তন বলা যেতে পারে। অ্যানি হ্যাথাওয়ের কর্ণে যেই প্রবিষ্ট হল যে তার প্রেমিকপ্রবর অন্য একটি কন্যাকে বিয়ে করবার জন্যে লাইসেন্স নিয়েছে, প্রথমটা সে নিদারুণভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেল, পরে ভয়ে আতঙ্কে ক্রোধে হয়ে উঠল উন্মাদিনী প্রায়। ঘটনার এই সর্বনাশা আকস্মিকতায় দিশেহারা হয়ে সে ছুটে গেল পাশের এক বাড়িতে।

লজ্জায় ক্ষোভে ডুকরে কেঁদে উঠে পড়শীদের কাছে প্রকাশ করে বললে কেন শেকসপীয়র নামক যুবকটি তাকে বিয়ে করতে অবশ্যই

বাধ্য। নতুবা তার সর্বনাশ। সেই বাড়ির কর্তাব্যক্তিটি ছিল অতীব সাদা সরল সংপ্রকৃতির মানুষ এবং নৈতিক চরিত্রাদি ব্যাপারে ছিল বিষম গোঁড়া ধরনের। সে এই ঘটনা শুনে উক্ত কুমারী কন্যাটির প্রতি দয়াপরবশ আর শেকসপীয়র ছোঁড়ার প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হয়ে পরদিনই মেয়েটিকে নিয়ে দুজনে গিয়ে টাউন হল-এ উপস্থিত হল। এবং অচিরাৎ শেকসপীয়র ও অ্যানি হ্যাথাওয়ের বরাবরে বিবাহের জন্য জন্য একটি বিধিমত বণ্ড সেখানে টাঙিয়ে দিয়ে এল।

এই পাত্রীটি ছিল শেকসপীয়রের চেয়ে পুরো আট বছরের বড়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বিয়ের পরদিন থেকেই নাকি তাদের দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠেছিল একটি যৎপরোনাস্তি হাস্যকর ট্র্যাজেডিবিশেষ।

এই কারণেই বোধকরি শেকসপীয়র তাঁর নাটকাদিতে পুরুষদের নিজের চেয়ে বয়সে বড় কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ হুঁশিয়ারী করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর দুর্জালা স্ত্রী অ্যানি হ্যাথাওয়ের সঙ্গে যে ক'টা দিন বা যে ক'টা রাত্রি বসবাস করেছেন, তা বুঝি হাতে গোনা যায়। তাঁর বিবাহিত জীবনের পনের আনা সময়ই কেটেছে প্রবাসে, লণ্ডনে। সম্ভবত তিনি বছরে একবারের বেশী নিজ পরিবারের কাছে কখনোই যেতেন না। কথিত আছে তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল তাঁর স্ত্রী।

ছোট ছোট মনোরম কটেজ, হলিহকস-এর বাগান, নয়নাভিরাম আঁকাবাঁকা পথ সমন্বিত আজকের স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন ইংলণ্ডের মধ্যে একটি সুন্দর ছোট শহর। কিন্তু শেকসপীয়র যখন জীবিত ছিলেন এবং তিনি যখন সেখানে বসবাস করতেন তখন কেমন ছিল জায়গাটা? তখন ছিল অতি নোংরা, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, এবং নানাবিধ রোগাদি অধ্যুষিত এক জঘন্য পল্লীবিশেষ। জলনিকাশের কোন পয়ঃপ্রণালী ছিল না। পথে পথে নোংরা শুয়োরের পাল অহোরাত্র আবর্জনা খেতে খেতে চরে বেড়াতো। শেকসপীয়রের বাবা ছিলেন ঐ নগরেরই জনৈক কর্মচারী। আস্তাবলের আবর্জনা

বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত করে রাখবার অভিযোগে একদা তাঁর জরিমানা হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃসময় ছিল সে সময় স্ট্যাটফোর্ড শহরের। ওখানকার লোকসংখ্যার আধাআধি মানুষ সাধারণের দান খয়রাতির উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত। অধিকাংশ মানুষই ছিল নিরক্ষর। শেকসপীয়রের না বাবা, না মা, না বোন, না মেয়ে, না নাতনী কেউই লেখাপড়ার ধার ধারত না। পরিপূর্ণ নিরক্ষর সবাই।

যে মানুষ ভবিষ্যতে ইংরেজী সাহিত্যের পরম গৌরব ও চরম শক্তিরূপে অভিহিত হবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল, নিয়তির এমনই পরিহাস যে তাঁকে কিনা মাত্র তের বছর বয়সে স্কুলের পাট চুকিয়ে জীবিকার ধান্ধার কাজে লাগতে বাধ্য হতে হয়। বাবা ছিলেন চাষী এবং দস্তানা প্রস্তুতকারক। শেকসপীয়র নিজে দুধ দুইতেন, ভেড়ার লোম ছাটিতেন, মাখন তৈরী করতেন এবং কাঁচা চামড়া ট্যান করতে সাহায্য করতেন।

অথচ শেকসপীয়র যখন মারা যান তখন তিনি তাঁর যুগের নিরিখ অনুসারে যাকে বলে যথার্থ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। লণ্ডনে যাবার বছর পাঁচেকের মধ্যেই অভিনেতা হিসেবে তিনি বেশ ভাল রোজগার শুরু করেন। অনতিকালের মধ্যে তিনি দু দুটি রঙ্গালয়ের শেয়ার ক্রয় করেন, সম্পত্তি বেচা-কেনার দালালী করেন এবং কথিত আছে অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে তেজারতিতে নামেন। সে সময় তাঁর উপার্জন বাৎসরিক তিনশ' পাউণ্ডে পৌঁছায়। আজকের তুলনায় সে যুগে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ছিল কমসে কম বারোগুণ বেশি। সুতরাং শেকসপীয়রের যখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস তখন তার উপার্জনের পরিমাণ আজকের হিসেবে আমাদের প্রায় লাখ টাকার মত ছিল বছরে।

তাহলে, স্বীয় পত্নীর জন্য তাঁর উইলে কত অর্থ রেখে গিয়েছিলেন বলে আপনার ধারণা হয়? একটি পাইপয়সাও নয়। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। একটি পুরনো শোবার খাট ছাড়া তিনি স্ত্রীর জন্যে স্থাবর-অস্থাবর কোন কিছুই রেখে যান নি। এই 'পরম দান'টিও বোধকরি

তিনি উইল শেষ হবার পরে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে স্থির করেছিলেন। কেননা এই দানের কথাটি লিখিত উইলের লাইনের ফাঁকে পুনঃ-সংযোজিত হয়।

পুস্তকাকারে নাটকগুলি প্রকাশের সাত বছর পূর্বেই শেকসপীয়রের মৃত্যু হয়। আজ যদি কেউ সেগুলোর প্রথম সংস্করণের যে কোন একটি কপি কিনতে চান তো তাঁকে ব্যয় করতে হবে মোটামুটি বারো লক্ষ টাকার মতো। অথচ হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, মিডসামার নাইটস ড্রিম প্রভৃতি নাটকগুলোর জন্য রচয়িতা আজকের নিরিখে হাজার টাকাও কখনো পান নি।

শেকসপীয়র বিষয়ে বিশারদ এবং তাঁর সম্পর্কে বেশ কয়খানি গ্রন্থপ্রণেতা ডঃ এস এ ট্যানেনবাউমকে একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এমন কোন প্রমাণ তাঁর কাছে আছে কি যার দ্বারা মনে হয় যে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনের উইলিয়াম শেকসপীয়রই শেকসপীয়র নামাঙ্কিত নাটকগুলির প্রকৃত লেখক। হ্যাঁ আছে, তিনি জবাব দেন, যে এ বিষয়ে তিনি নাকি নিশ্চিত।

এতদ্‌সত্ত্বেও অনেক লোকের ধারণা যে, শেকসপীয়র বলে কেউ কোনকালে ছিল না। এবং তাঁরা খান-দশবারো গ্রন্থে একথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, শেকসপীয়র নামধেয় নাটকাবলীর প্রকৃত লেখক : এক হয় স্যার ফ্রান্সিস বেকন, নয়ত, আর্ল অব অক্সফোর্ড।

সেকথা থাক। শেকসপীয়রের সমাধিস্তম্ভে নিম্নোক্ত বিচিত্র নিয়তির বাণীটি উৎকীর্ণ করা রয়েছে :

> Good friend for Jesus sake for beare,
> To digg the dust enclosed here.
> Bleste be ye man yt spare thes stones
> And curst be he yt moves my bones.

স্থানীয় ক্ষুদ্র গির্জার ধর্মোপদেশদান মঞ্চের সম্মুখে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে ঐ সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়েছিল কেন? তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার সম্মানে কি? যে অমর প্রতিভাকে তিনশ

বছর ধরে সারা বিশ্বের মানুষ পরম শ্রদ্ধা দেখিয়ে আসছে সেই প্রতিভাই কি কারণ? না। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মোটেই তা নয়। যে কবি-নাট্যকার ভবিষ্যৎ ইংরেজী সাহিত্যের শুকতারা হিসেবে চিহ্নিত হবার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে জন্মেছিলেন তাঁকে গির্জার অভ্যন্তরে কবর দেওয়া হয়েছিল তার কারণ শুনলে হাস্যোদ্রেক হয়। যেহেতু তিনি তাঁর নিজ শহরের মানুষজনকে অর্থ ধার দিতেন, তাই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ঐটুকু ধর্মীয় সম্মান।

প্রখ্যাত 'সাইলক' চরিত্রস্রষ্টা মানুষটি যদি স্বীয় শহরের লোকেদের সুদে টাকা ধার না দিতেন তাহলে বোধকরি তাঁর প্রাণহীন দেহের হাড়গোড় অচিহ্নিত কোন কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, এ বিষয়ে বুঝি সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পূর্বোল্লিখিত কাহিনীটিই সারা বিশ্বে প্রচলিত, বিপুলাকার পুস্তক থেকে পাঠ্য বই-এর মধ্যেও একই কথা বিশদ বা সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হয়ে দুনিয়ার তাবৎ লোকের যুগ যুগ ধরে জানা হয়ে গেছে।

এবার শুরু হচ্ছে নতুন এক কাহিনী। শেকসপীয়র ও তার জীবনী বা এমন কি তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন ও চমকপ্রদ আলোকপাতের এক গভীর গবেষণা :—

[এ এমন একটি খুনের কাহিনী যা এতাবৎ লিখিত যে কোন হত্যাকাহিনীর চেয়েও চমকপ্রদ। কল্প গোয়েন্দা কাহিনীর যাবতীয় বস্তুই এর মধ্যে রয়েছে—এমন কি একটি রহস্যময় মৃতদেহ এবং একজন 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' পর্যন্ত আছে এ ঘটনায়, আছে সিক্রেট এজেন্ট, এতদসত্ত্বেও এটি কিন্তু কোন কাল্পনিক গল্প নয়। অপর পক্ষে, সাহিত্য ইতিহাসের প্রতি যে চরম অবিচার করে চলেছে আজও, সেটা প্রমাণ করবার মানসে সাক্ষ্য-প্রমাণ-নথীপত্র অনুসন্ধান করবার অভিনব এক বিবরণ এটি।]

এবার কাহিনীর শুরু :

লণ্ডনের কয়েক মাইল বাইরেকার ছোট্ট শহর ডেপ্টফোর্ড। সময়, পনের শ' তিরানব্বুই খৃস্টাব্দের তিরিশে মে। সকাল। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ঘাটে নোঙর করা রয়েছে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকের কিংবদন্তীসম হালকা পালতোলা জলযান: 'গোল্ডেন হিন্দ'। এটি দেখবার জন্য স্বয়ং রাণী এলিজাবেথ সহ বহু দর্শক এসেছেন এই নদীতীরে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঐ শহরের মানুষজনেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল: না, লণ্ডনে যে প্লেগ মহামারী উক্ত নগরীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তার স্পর্শ এখনো লাগেনি তাদের ক্ষুদ্র শহরে। তারা সত্যই ভাগ্যবান। অপরাপর দিনের মতো সেদিন তারা অপেক্ষা করতে লাগল লণ্ডন থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বেশকিছু আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য।

সেই বহিরাগতের মধ্যে আমাদের এ কাহিনীর উল্লেখযোগ্য চার ব্যক্তি সেদিন এসে উপস্থিত হল সে শহরে। এদের তিনজন সন্দিগ্ধ চরিত্রের মানুষ। একজনের নাম ইনগ্রাম ফ্রাইজার। কোমরের বেল্টে ছুরি গোঁজা এই লোকটি একজন প্রবঞ্চক এবং স্পাই। দ্বিতীয়টি হল ফ্রাইজারের কর্মকাণ্ডে প্রায়শঃই ফাঁদরূপে নিযুক্ত সহকারী নিকোলাস স্কেরেস। তৃতীয় লোকটি হল রবার্ট পোলে নামক জনৈক সরকারী সিক্রেট এজেন্ট, যে ব্যভিচারী ও নিরস নিষ্ঠুর রূপে কুখ্যাত।

চতুর্থজন হল জনৈক যুবা পুরুষ। যার নাম প্রায়শঃই হয় মার্লিন নয়তো মোঁরলে অথবা মারলো রূপে লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা তাকে জানি ক্রিস্টোফার মারলো হিসাবেই। উইলিয়াম শেকসপীয়রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই মারলোই ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মহান কবি, নাট্যকার এবং সেরা এক সাহিত্যিক প্রতিভা।

এই চারজন এসে আশ্রয় নিল ডেম এলিনর বুল নামক এক ব্যক্তির পান্থশালায়। পরবর্তীকালে করোনার উইলিয়াম ড্যানবির রিপোর্টে জানা যায় এই চার ব্যক্তি 'একই সঙ্গে সময় কাটিয়েছে... একসঙ্গেই আহার করেছে...আহারের পর একসঙ্গে বাগানে হাঁটাহাঁটি

করেছে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত...পরে একসঙ্গেই নৈশাহার সেরেছে।'

নৈশ ভোজনের পর মারলো শুয়ে পড়েছে আর ওর বিছানার দিকে পেছন ফিরে বাকি তিনজন বসেছে একটা বেঞ্চিতে। কি একটা ব্যাপার নিয়ে সহসা তর্ক-বিতর্ক কলহ শুরু হয়ে যায়। ফ্রাইজার এবং মারলো 'পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যাদি প্রয়োগ করে' এই পান্থশালায় দেয় খরচাপাতি নিয়ে।

ফ্রাইজারের ছুরিকা মারলোর নাগালের মধ্যে খসে ওঠে। চরম ক্রুদ্ধ কবি সে ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে আঘাত হানে। ফ্রাইজার কবির হাত ধরে ফেলে 'সেই ধস্তাধস্তির মধ্যেই...সে ক্রিস্টোফার মারলোকে তার ডানদিকের চোখের ওপর সাংঘাতিক ভাবে আহত করে...সেই কালান্তক আঘাতেই মারলোর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।'

করোনারকে ডাকা হয় সেই পান্থশালায়। তিনি লক্ষ্য করেন যে ফ্রাইজার আদৌ পালিয়ে যায় নি। সে নিজেকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রার্থনা জানায়। করোনার তাকে জেলে পাঠিয়ে দেন।

পয়লা জুন তারিখে মারলোকে এক অজ্ঞাত কবরে সমাহিত করা হয়। ডেপ্টফোর্ডের ক্ষুদ্র গির্জার ভিকারের রেজেস্ট্রি বইতে একটি মাত্র বাক্যে এ ঘটনার কথা উল্লিখিত রয়েছে, তাও ভুল বানানে: 'পনের শ তিরানব্বুইয়ের পয়লা জুন ক্রিস্টোফার মারলোর (Marlow) ফ্রান্সিস (FFrancis) ফ্রেজারের (-Frezer) দ্বারা নিহত হয়েছে।'

এই ভাবেই প্রতিশ্রুতিবান সেরা এক সাহিত্যিক প্রতিভার প্রস্থানপর্ব সমাপন হয় সেই সুদূর ১৫৯৩ খৃস্টাব্দে। তারপর কেটে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। প্রায় ৩৪৩ বছর বাদে আবির্ভূত হল কালভিন হফ্‌ম্যান নামক এক চাঞ্চল্যকর গবেষক। আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল অদ্ভুত এক সাহিত্যবিষয়ক গোয়েন্দা কার্যের অকল্পনীয় কর্মকাণ্ড। যার তুলনা বুঝি নিরবধিকালের ইতিহাসে নেই।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দে যখন এই অভিনব অনুসন্ধানকার্যে ব্রতী হয় হফ্‌ম্যান তখন দ্রুতলয়ে কথনশীল ধূসর বাদামী চুল সমন্বিত গাট্টাগোট্টা এক

তাজা তরুণ। পনের বছর বয়সে অভিনেতা হবার বাসনা নিয়ে সে হলিউডে যায়। অতঃপর কি ভেবে নিউইয়র্কে ফিরে আসে ইংরেজী অধ্যয়ন ও নাটক লেখা শিক্ষার মানসে।

এক শুভদিনে বুঝি ওর হাতে আসে মারলোর রচনাবলী সম্বলিত একটি পুস্তক। অচিরেই পুস্তকের গভীরে সে ডুবে যায়। এরপরই জন্মলাভ করে তার অনিবার্য কৌতূহল। যে কৌতূহল তাকে টেনে নিয়ে যায় তুলনাবিহীন এক ডিটেকটিভ-গবেষণা কার্যে, যার নিরবচ্ছিন্ন সময়কাল সুদীর্ঘ ১৯টি নিশ্ছিদ্র বছর। এই নিদারুণ অনুপ্রেরণা তাকে ধূলোভর্তি প্রাচীন পুস্তক সম্বলিত লাইব্রেরীর তাকের পর তাক খাটায়, নিমজ্জিত করে এলিজাবেথীয় ক্রাইম-ইতিহাস পঠনের সাগরে, রাজকীয় জীবনযাত্রা ও রাজসভার যাবতীয় খুঁটিনাটি অনুসন্ধানে তাকে ব্রতী করে তোলে। এক সময়, এমন কি একটি মাইন ডিটেকটর নিয়ে পাতিপাতি অনুসন্ধান কার্যে নিযুক্ত করে নিজেকে এক ইংলিশ ভূম্যধিকারীর খাস তালুকে। এ গবেষণার সময় তাকে এমন সব অজস্র বাধা, ঠাট্টা বিদ্রূপ অবহেলার মুখোমুখি হতে হয় যে যেমন তেমন হালকা চরিত্রও কম নিষ্ঠাবান মানুষ হলে তখুনি তাকে একাযে রণভঙ্গ দিতে হত। কিন্তু হফম্যান প্রকৃতই অন্যধরনের নিঃসীম অধ্যবসায়যুক্ত লৌহ পুরুষ, তাই বুঝি মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে সে এক অকল্পনীয় সাহিত্য ইতিহাস গড়ে তুলেছিল।

সেই সুদূর ১৯৩৬-এ একটিমাত্র সন্দেহই তাকে এই অবিশ্বাস্য কার্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হল মারলোর 'শক্তিশালী লাইন' উইলিয়াম শেকসপীয়ার নামক অপর একজন প্রখ্যাত ইংলিশ লেখক-এর কল্পপথে উড্ডীয়মান শব্দসমূহের বিস্ময়কর সাদৃশ্য। অর্থাৎ দুজনের রচনার সমান্তরালীয় সমতা। সে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নোট করে নিল। যেমন উভয় লেখকই 'rosecheek'd Adonis' পদ সমষ্টিটি ব্যবহার করেছিল। নোট করতে করতে সেটা দাঁড়াল গিয়ে বিরাট এক ভল্যুমে। এবং ক্রমে ক্রমে এক অভিনব বিশ্বাসের জন্মলাভ হল—সেটি হল, শেকসপীয়রের রচনাবলী— শেকসপীয়রের দ্বারা আদৌ লিখিত হয় নি।

এ ধরনের গ্রন্থকারিত্বের-সংশয় থিয়োরী অবশ্য নতুন নয়। প্রায় অর্ধডজন বিভিন্ন বিকল্প রচয়িতাকে ইতিপূর্বে শেকসপীয়র রচনাবলীর আসল লেখক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে কমবেশী বিশ্বস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই। যে নামগুলো উচ্চারিত হয়েছিল তা হল: গুণশালী আর্ল অফ অক্সফোর্ড এডওয়ার্ড ডি ভেরে, তদানীন্তন কালে অসাধারণ দার্শনিক প্রতিভা ফ্রান্সিস বেকন, কাউন্টেস অফ পেমব্রোক, এবং 'উইলিয়াম শেকসপীয়র' নামক অপর একজন ব্যক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব সন্দেহ ও সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয় স্বয়ং শেকসপীয়রের সম্বন্ধে ঝাপসা বা গণ্ডগোলে ঘটনাসমূহের দ্বারা। অথবা সম্ভবত বলা যায়, প্রকৃত সঠিক ঘটনার স্বল্পতার জন্যেই।

১৫৯৩ খৃস্টাব্দে শেকসপীয়র স্বাক্ষরিত উৎসর্গ সহ 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস' প্রকাশিত হবার সময় লোকে এই পুস্তক ও তাঁর রচয়িতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদই অবগত ছিল না। তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে বারজেস সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর ব্যাপটাইজিকরণ হয় ২৬শে এপ্রিল ১৫৬৪তে। তিনি বিবাহ করেন ২৭শে নভেম্বর ১৫৮২ খৃস্টাব্দে। পরের বছর প্রথম পিতা হন, এবং ১৫৮৫-তে তাঁর জমজ সন্তান হয়। বাস এইটুকু মাত্র। ১৫৯৩-এর পর থেকে আমরা আর বিশেষ কিছু জানতে পারি না। অবশ্য এ রেকর্ডও পাওয়া যায় যে তিনি বহু থিয়েট্রিকাল কোম্পানীতে যোগদান করেন, পরে প্রখ্যাত 'গ্লোব অ্যাণ্ড ব্ল্যাক ফ্রায়ার থিয়েটার্সে'র অংশীদার হন। এক সময় সাক্ষী ও মামলাকারী হিসেবে আদালতেও উপস্থিত হয়েছিলেন। কালক্রমে জমি ও বাড়ি কেনার ইতিহাসও আমাদের নথীপত্র মোতাবেক জ্ঞান গোচর হয়। তাঁর উইল ছিল, এবং তাঁর মৃত্যুর তারিখটিও আমাদের অজানা নয়। আর আমাদের সামনে তো রয়েছে তাঁর নাটকাবলী।

এতদসত্ত্বেও তাঁর নাটকগুলি কিন্তু তাঁর গ্রন্থকারিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে সাক্ষ্যদান করে না। শেকসপীয়রের হস্তলিখিত কোন পাণ্ডু-লিপির অস্তিত্ব নেই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে টাইটেল পৃষ্ঠায়

শেকসপীয়র স্বাক্ষরিত নাটকগুলি 'তাঁরই রচিত'। তাঁর অধিকাংশ নাটকই তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ ১৬২৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'ফাস্ট' ফোলিও'তে।

বস্তুতঃ পক্ষে 'ফোলিও'তে প্রকাশিত ৩৬টি নাটকের মধ্যে মাত্র ১৮টি পূর্বে মুদ্রিত হয়। তারও কিছু কিছু কোন লেখকের নামবিহীন অবস্থায়ই প্রকাশিত হয়েছিল। এর উপর দেখা যায়, 'ফাস্ট' ফোলিও'র পর প্রকাশিত কিছু নাটক কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ ব্যক্তি শেকসপীয়রকেই সে সবের নাট্যকার রূপে ভূষিত করেন, আবার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নাম স্বাক্ষরিত কিছু নাটকের রচয়িতা হিসেবে তাঁকে আদৌ স্বীকার করেন না।

অধিকাংশ শেকসপীয়র-বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অন্তুতপক্ষে তাঁর কিছু কিছু রচনা অবশ্যই অপরাপর ব্যক্তিদের সহযোগিতায় রচিত হয়েছিল। অতএব 'শেকসপীয়র লিখেছেন' কথাটিকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, পণ্ডিত ব্যক্তিদের 'বিবেচনায়' বা 'মতে' তিনি যা লিখেছেন তাবেই—এটাকে যদি-বা সাহিত্য-বিচারের নিখুঁত প্রক্রিয়ারূপে ধরা যায়, তবু এর মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

এবার দেখা যাক সেই সেই অজস্র প্রশ্নাবলীর কয়েকটি যেগুলো হফ্‌ম্যান ছাড়াও অপরাপর বহু পণ্ডিতজনকে এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল।

যেমন, শেকসপীয়রের পক্ষে এই ধরনের অতুলনীয় শব্দজ্ঞান ও শব্দচয়ন এবং বিদ্যাবত্তা আহরণের সুযোগ প্রাপ্তি কি ভাবে সম্ভব হয়েছিল ?

তিনি যে শুধুমাত্র কলমের মুখে অজস্র ধারায় সংখ্যাতীত বিচিত্র শব্দাবলীই ব্যবহার করে গিয়েছেন তাই নয়, দেখা যায় তাঁর আইন বিষয়ক পরিভাষা ব্যবহার, চিকিৎসা বিষয়ক এবং ঔষধপত্রাদির ব্যাপারে অগাধ পাণ্ডিত্য—সবার উপরে সম্ভ্রান্ত ও অতি অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা আচার আচরণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সহজ জ্ঞানের বিস্ময়কর পরিচয়ও দিয়ে গেছেন তিনি।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, একজন সামান্য দোকানদারের পুত্র হিসাবে উক্ত অভিজাত মহলে প্রবেশাধিকার তাঁর ছিল কি? যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন তাহলে হয়ত সে সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো পড়েনই নি, এমন কি কোন গ্রামার স্কুলে উপস্থিতিরও কোন রেকর্ড নেই। তবে কি বই পড়ে? কিন্তু অত বই-ই বা তিনি পাবেন কোথায়?

সে সময় ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সর্বোত্তম লাইব্রেরী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে কয়েকশ' মাত্র বই ছিল, সে সব পুস্তক এত মহামূল্যবান বলে বিবেচিত হত যে তাদের শেল্ফের সঙ্গে চেইন দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা হত। তখন কোন সাধারণ পাঠাগার ছিল না দেশে। আর দেখা যায় শেকসপীয়র তাঁর উইলে কোন পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করে যান নি।

শেকসপীয়র কিভাবে জ্ঞান আহরণ করলেন এই ধাঁধা-কে সামনে রেখেই হফ্‌ম্যান তার অনুসন্ধান কার্য শুরু করল। বেন জনসনের মতে শেকসপীয়র 'সামান্য ল্যাটিন ততোধিক সামান্য গ্রীক' শিখেছিলেন, সেটাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়েছিল? যদি তিনি সামান্য ল্যাটিন ও গ্রীক শিখে থাকেন, তাহলে ওভিড, লুকান ও প্লটাস বিষয়ে অধিগত হলেন কি প্রকারে? বিশেষ করে শেষোক্তটি যখন সে সময় অনূদিতও হয় নি। অথচ ওটাই ছিল 'দি কমেডি অফ এররস'-এর মূল সূত্র। এর সত্ত্বেও কিন্তু শেকসপীয়র স্কলারগণ খুঁজে পান নি।

এরপর হফ্‌ম্যান সম্মুখীন হল ভৌগোলিক ধাঁধার। শেকসপীয়রের কয়েকটি নাটকের অকুস্থল ইতালীতে। সে দেশ সম্পর্কে দেখা যায় নাট্যকারের অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞান। দিকজ্ঞান, ডাইনে বাঁয়ে পেছনে কোথায় কোন পর্বত অবস্থিত, কোন শহর নগর থেকে কোন কোন পথ বাহিত হয়ে সেখানে পৌছন যায় প্রভৃতির সম্যক জ্ঞান দেখে অবাক মানতে হয় যে এসব রচনা এমন একজন লেখকের কলম থেকে বেরিয়েছে যিনি জীবনে কখনো ইংলাণ্ডের বাইরে পদার্পণ করেন নি। আর যাঁর কাছে অতি সাধারণ প্রাথমিক জাতীয় মানচিত্র ছাড়া আর কিছুই থাকবার

কথা নয়।

কিন্তু ভৌগোলিক হেঁয়ালির চেয়েও আরেকটি ব্যাপার সমধিক হতবুদ্ধি করল হফ্‌ম্যানকে। আমরা জানি যে শেকসপীয়রের কিছু কিছু রচনা রচিত হয়েছিল সেই সুদূর ১৫৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই। অথচ যে সময়ে কীড, ন্যাসে, পীল, মারলো, চ্যাপম্যান এবং আরও অনেকে পরস্পরের কাছে পরস্পরের সম্বন্ধে উল্লেখাদি করছিলেন, সে সময়ে কিন্তু অর্থাৎ ১৫৯৩-এর আগে পর্যন্ত কেউই 'শেকসপীয়র'-এর বিষয়ে এক বর্ণও উল্লেখ করেন নি। সম-সাময়িক যাবতীয় সাহিত্যে একটি-মাত্র 'কাল্পনিক' উল্লেখ রয়েছে। রবার্ট গ্রীন-এর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীকে একটি ছত্রে 'হেনরী সিকসথ' থেকে প্যারডি করে এমন একটি up start crow-র কথা উল্লিখিত হয় যে, নিজেকে দেশের একমাত্র Shake-scene বলে মনে করত।

পণ্ডিতগণ এই শব্দদ্বয়কে আঁকড়ে ধরে সিদ্ধান্ত করলেন এর মধ্যে স্বয়ং শেকসপীয়রের নাম ১৫৯৩-এর পূর্বকালে প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত রয়েছে। অথচ হফ্‌ম্যানের মতে ভাবাবেগ উদ্রেক করে স্টেজ কাঁপানো যে কোন অভিনেতার পক্ষেই সাধারণভাবে গুণবাচক শব্দ ছিল 'Shake-scene'। এর সঙ্গে Shakespear-এর নামের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের শীর্ণ সূত্রের মাধ্যমেই শেকসপীয়র-কিংবদন্তী গড়ে উঠেছিল। মৃত্যুর পরে এ উপাখ্যান ক্রমান্বয়ে বহুগুণে বর্ধিত হতে থাকে।

একথা সন্দেহাতীত যে অভিনেতা শেকসপীয়র একজন ছিলেন। এবং তাঁর স্বাক্ষরিত নাটকাবলী একজন শক্তিশালী-প্রতিভাধরের দ্বারাই বিরচিত। কিন্তু 'অভিনেতা' শেকসপীয়রের আকৃতি ও 'লেখক' শেকসপীয়রের ভাবমূর্তির মধ্যে ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষ দেখা দিল। কোথায় যেন অসাদৃশ্য, কোথায় যেন অমিল। তাই বুঝি শুরু হল এমন কারুর সন্ধান যাকে 'লেখক' রূপী শেকসপীয়রে দাঁড় করান যায়। যথা, বেকন, অক্সফোর্ড, পেমব্রোক।

এদের প্রত্যেকেই শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, পর্যটনকারী এবং

ছদ্মবেশী প্রকাশনায় আগ্রহী। কিন্তু এদের প্রত্যেকের থিওরীতে একটি মাত্রই ত্রুটি দেখা গেল। এদের কেউই উক্ত প্রতিভাধর নাট্যকারের মতো কোন কিছু লেখেন নি।

হফ্‌ম্যানের মতে, শুধু একজন মাত্র প্রতিভাধরই ছিলেন সে যুগে যাঁর কবিতা এবং নাটকাদি তথাকথিত, 'শেকসপীয়রের' প্রতিভার সঙ্গে সমতুল বলে বিশ্বাস করা যায়। তিনি হলেন, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-এর জনক, মহান পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী এবং সর্বাধিক সম্মানিত সমকালীন নাট্যকার লেখক: ক্রিস্টফার মারলো।

মুশকিল হল সেই মারলো, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, অপঘাতে নিহত হয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও হফ্‌ম্যান যতই মারলো এবং শেকসপীয়র পড়তে লাগল ততই সে বিস্মিত হয়ে গেল উভয়ের রচনার বিস্ময়কর সমতা লক্ষ করে। তার মিলের দৃষ্টান্ত বাড়তে বাড়তে এক সময় শত হল, তারপর আরও বেড়ে দাঁড়াল সহস্রে। রিসার্চ কার্যে উন্মোচিত হল শেকসপীয়র বিশেষজ্ঞরা এক থেকে বারোটি পর্যন্ত 'শেকসপীয়র-নাটক'-এর গ্রন্থকার হিসেবে পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে মারলোকেই চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য সাল তারিখ হিসেবে উল্লিখিত হল ১৫৯৩-এর পূর্ব পূর্ব বৎসর; কেন না সে বছরই তো ডেম বুলস্ পান্থশালায় মারলো উক্ত ফ্রাইজারের হাতে তথাকথিত নিহত হয়ে গেল।

কিন্তু মজা এই যে মারলোর মৃত্যুর পরেও শেকসপীয়রের বহু নাটক লিখিত হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যেও সন্দেহজনক মিল লক্ষ করা গেল। দেখা গেল শুধু যে মারলো ব্যবহৃত ফ্রেজগুলিই পুরো-পুরি নেওয়া হয়েছে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে শেকসপীয়র মারলোর লাইন বা শব্দসমষ্টিকেই উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। অথচ মারলো ছাড়া অপর কোন নাট্যকারের কোন উদ্ধৃতি আদৌ নেই তার নাটকাবলীতে।

হফ্‌ম্যানের নজরে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হল মারলো এবং শেকসপীয়রের যাবতীয় রচনাবলীতে একই ধরনের সৃষ্টিশীল কল্পনা অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিদ্যমান, আহা মারলোর যদি ইতিমধ্যে মৃত্যু

না হত। অতএব এবার হফ্‌ম্যান স্বয়ং মারলোর জীবনী নিয়ে পড়ল।

শেকসপীয়রের মতই মারলোও জন্মগ্রহণ করে ১৫৬৪-তে একটি ছোট্ট শহর ক্যান্টারবেরিতে। উভয়ের শৈশবকালের এই সাদৃশ্যের এখানেই ইতি। যদি রেকর্ডপত্র সঠিক হয় তাহলে দেখা যায় শেকসপীয়র কখনো কোন কলেজে পড়েন নি। অপর পক্ষে মারলো ছিল একজন খুবই মেধাবী এবং কৃতি ছাত্র। কেন না সে পনের বছর বয়সে ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রাল সংযুক্ত কিংস স্কুলে স্কলারশিপ নিয়ে যায়। সেই প্রখ্যাত বিদ্যালয়েই সে স্বনামধন্য পরিবারের বংশধরগণের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা হল: লাইলি, সিডনী, ডবসন এবং বেনথাম। এখানেও সে পড়াশোনায় খুবই কৃতিত্ব দেখায়, কেন না ১৫৮১-তে স্কলারসিপসহ কেমব্রিজে ভর্তি হয়। সেখানে ওভিড এবং লুকান-এর অনুবাদ করে। সম্ভবত এই সময়ে অর্থাৎ বাইশ বছর বয়সে সে রচনা করে তার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ট্যাম্বার লেইন'।

এরপরেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ১৫৮৭ খৃস্টাব্দে মারলো যখন এম. এ. ডিগ্রী নেবেন, সহসা কলেজ কর্তৃপক্ষ বেঁকে দাঁড়ালেন। বহুদিন ধরে নাকি তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তাকে ক্যাথলিসিজম-এর জন্য (রাজদ্রোহের সামিল) সন্দেহ করা হল। এর প্রকৃত কারণ জানা যায় প্রায় ৩৫০ বৎসর পর ১৯২৫ এ আকস্মিক ভাবে আবিষ্কৃত কিছু নথিপত্রের মাধ্যমে।

ঘটনায় প্রকাশ যে কলেজী-জীবনেই মারলো রাণী এলিজাবেথ এবং তাঁর স্পাই সংগ্রাহক স্যার ফ্রান্সিস ওয়ালসিংঘাম-এর 'সিক্রেট এজেন্ট' ছিলেন। তিনি নাকি মেরী অফ স্কটল্যাণ্ডকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এইরূপ সন্দিগ্ধ একদল ক্যাথলিক ইংরেজদের সঙ্গে মোলাকাৎ করবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং রেইমস্ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সে কারণেই বোধহয় তার কলেজে অনুপস্থিতি হয়।

অতএব যখন তাঁর ডিগ্রী প্রাপ্তির আশা দোদুল্যমান অবস্থায়,

সে সময় স্বয়ং প্রিভি কাউন্সিল এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নির্দেশ দেন—যার মোটামুটি সারার্থ হল . মারলো যে কিনা দেশের হিতার্থে হার ম্যাজেস্টি কর্তৃক কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত, যা কলেজ কর্তৃপক্ষের অজানা, সেই মানুষ কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অখ্যাতি পায় এটা রাণী আদৌ পছন্দ করেন না।

তদানীন্তন প্রাচীন বানানে মূল নির্দেশটি এই প্রকার—'...it was not her majestie's pleasure that anie one emploied as he had been in matters touching the benefitt of his countrie should be defamed by those that one ignorant in th' affaires he went about.'

বলাবাহুল্য কলেজ কর্তৃপক্ষ এরপর তাঁকে অতি দ্রুত ডিগ্রী দিতে পথ পেল না।

হফম্যানের গবেষণায় প্রকাশ, মারলো গ্র্যাজুয়েট হবার পর তাঁর ভাগ্য আরও ফিরে গেল। থমাস ওয়ালসিংঘাম তাঁর একজন হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবে পরিণত হল। লণ্ডনে তদানীন্তন বাঘা বাঘা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তিনি ওঠাবসা করতে লাগলেন, এক সময় থমাস কীড-এর সঙ্গে একই ঘরে বাস করতেন। ওয়ালটার র‍্যালে, কবি চ্যাপম্যান এবং অঙ্কবিদ হ্যারিয়ট প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়শঃই আলোচনায় বিতর্কে যোগ দিতে লাগলেন। নাট্যকার হিসাবে প্রভূত সাফল্য অর্জন করলেন। 'ট্যাম্বার লেইন' দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। এবং এর সর্বোচ্চ পরিসমাপ্তি দেখা দিল বুঝি শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডি সমূহে! এরপর একে একে এল আরো জনপ্রিয় গ্রন্থ: ডক্টর ফাউস্টাস, দি জু অফ মাল্টা (শেকসপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে'র উৎস), এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড, ডিডো, কুইন অফ কার্থেজ প্রভৃতি।

অতঃপর সাফল্যের চূড়ায় এসে... চরম নিয়তি এক প্রচণ্ড আঘাত হানল।

১৫৯৩ খৃস্টাব্দের ১২ই মে নাস্তিকতাবাদ-এর অভিযোগে কিড গ্রেপ্তার হলেন। পীড়নযন্ত্র দ্বারা জেরার মুখে কিড বললেন, তার ঘরে

পাওয়া তিন পৃষ্ঠাব্যাপী নাস্তিকতাবাদের ডকুমেন্ট তাঁকে মারলো দিয়েছে। কিডের গ্রেপ্তারের ছয়দিন বাদে মারলোকে ধরে নিয়ে আসা হল স্ক্যাডবারিতে অবস্থিত ওয়ালসিংঘামের এস্টেট থেকে, সেখানে সে সময় তিনি বসবাস করছিলেন। তাঁকে দৈনিক প্রিভি কাউন্সিলে হাজিরা দেবার শর্তে (যতদিন না মামলা শুরু হয়) মুক্তি দেওয়া হল। এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃদু ব্যবহার পাওয়া সম্ভব হল বুঝি ওয়ালসিংঘামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৌজন্যেই।

কিন্তু তাঁর অবস্থা ও পরিস্থিতি দাঁড়াল নিদারুণ বিপজ্জনক হয়ে। দণ্ডভোগ তাঁর মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। অন্ততপক্ষে চরম নিপীড়ন ও কারাদণ্ড ভোগ তো অনিবার্য। ঠিক এবম্বিধ অবস্থায়ই, চরম বিপর্যয়ের মুখে তিনি সেই অশুভ ৩০শে মে তিন সহচরসহ গিয়ে উপস্থিত হলেন ক্ষুদ্র শহর ডেপ্‌টফোর্ডে এবং...।

হফ্‌ম্যানের মতে এইভাবে চারজন গিয়ে ওখানে মিলিত হওয়াটা এক বিচিত্র ব্যাপার। ঐ সব বেপরোয়া গুণ্ডাশ্রেণীর মানুষ, যারা ইংল্যাণ্ডব্যাপী গুপ্তচর চক্রের অন্যতম সদস্য, সেই সব লোকেদের সঙ্গে সারাদিন ধরে সেখানে মারলো কি করছিলেন?

একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যে ঐ তিন বেপরোয়ার মত তিনি নিজেও ওয়ালসিংঘামের অধীনস্থ বশংবদ ছিলেন! অতএব বোঝা যায় লোক তিনটি তাঁর পরিচিতই ছিল। পরবর্তীকালে করোনার রিপোর্টে জানা যায় 'ওরা চারজন বহুঘণ্টাব্যাপী আলাপ আলোচনা করে।'— কিন্তু বিষয়টা কি হতে পারে এত আলোচনার?

তারপরই তিনি নিহত হলেন। কিন্তু এটাও এক অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড। যে আঘাতের কথা বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা কোন মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়। এটাই আজকের ডাক্তারদের অভিমত। দ্বিতীয়ত, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ আঘাতকারী বসে ছিল মারলোর দিকে পেছন ফিরে বেঞ্চিতে, ঐ অবস্থায় কাউকে মারাত্মক আঘাত হানা সম্ভব কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান।

আরেকটা ব্যাপার হল, স্কেরেস ও পোলে ছাড়া অন্য কোন সাক্ষীকে ডাকা হল না কেন? সরাইখানার মালিক ডেম বুলকেও কেন ডাকা হয় নি? মারলোকে কেন অনির্দিষ্ট ও অচিহ্নিত এক কবরে সমাহিত করা হল? এসব প্রশ্ন বড়ই সন্দেহ উদ্রেককারী।

এবার ঘটনায় আরও অবিশ্বাস্য পরিণতি দেখা দিল। ফ্রাইজার জেল-এ গেল এবং মাসখানেক বাদে স্বয়ং এলিজাবেথ-এর মার্জনা পেয়ে মুক্তি পেল। কারণ হিসেবে বলা হল: অপরাধ সংঘটিত হয়েছে স্রেফ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

তাজ্জবের ওপরে তাজ্জব, মুক্তির-একদিন বাদে নিহত মারলোর পরম বান্ধব ও হিতৈষী ওয়ালসিংঘাম কর্তৃক আসামী ফ্রাইজারকে তার পূর্বকার্যে পুনর্বহাল করা হল।

ওয়ালসিংঘামের মত মানুষ কিনা তাঁর আশ্রিত একজন প্রখ্যাত মানুষের হত্যাকারীকে পুনর্নিযুক্ত করবেন, এটা একটা পরম অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয়। শুধু ফ্রাইজার নয়, পোলেও এক সময় পুনর্বহাল হল চাকুরিতে।

ওয়ালসিংঘামের মত আরও উচ্চমহলে উদ্‌ঘাটিত হবার পথ চিরদিনের মত বন্ধ করে দেবার মানসেই কি মারলোকে 'হত্যা' করা হল? কারণটা এই হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য যে, দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মারলো, ওদের মনোগত বাসনা না জেনে ফ্রাইজার পোলেও স্কেরেস-এর মত দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে দিন কাটাবেন এক সরাইখানায়।

অবশেষে হফম্যান আরও চমৎকার একটি বৃত্তান্ত আবিষ্কারে সমর্থ হল র‍্যাকের ধুলো ঘেঁটে ঘেঁটে। বহু বছর পর্যন্ত নাকি বন্ধু-বান্ধবরা জানত না যে মারলো নিহত হয়েছে। লণ্ডনে চালু হয়ে গিয়েছিল যে তিনি প্লেগে দেহত্যাগ করেন। স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, এ ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন করে নি বা কথা বলে নি। বা বলতে সাহস করে নি।

গবেষণার পর্যায়ে এক সময়ে হফম্যানের মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে মারলো ডেপট্‌ফোর্ডে যখন ঐ ত্রয়ী বেপরোয়া মানুষের সঙ্গে

মিলিত হলেন, তার পেছনে অবশ্যই ছিল পূর্বপরিকল্পিত গূঢ় কোন উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটি হল, সম্মুখে পীড়ন এবং মৃত্যুদণ্ড বিধায় মারলোকে ইংল্যাণ্ড থেকে সরে পড়তে হবে। এ পরিকল্পনা অবশ্যই ওয়ালসিংঘামের ও তার বশংবদ তিন চেলার সাহায্যে সঙ্ঘটিত করা হয়। সম্ভবত রাত্রির অন্ধকারে কোন এক ভবঘুরেকে নিয়ে আসা হয় পান্থশালায়। অতঃপর সেই ছোট্ট ঘরে তাকে মদ্যপানে বেহুঁশ করিয়ে মারলোর পরিবর্তে তাকেই হত্যা করা হয়।

ওয়ালসিংঘাম অবশ্যই করোনারকে ঘুষ দানের দ্বারা বশীভূত করেন। ভবঘুরের মৃতদেহ ঝটিতি এক অচিহ্নিত কবরে সমাহিত করে ফেলা হয়। এবং মারলো সমুদ্রপাড়ি দিয়ে নীরবে দেশত্যাগ করেন। এরপর...সম্ভবত ওয়ালসিংঘামের বিস্তৃত বিরাট এস্টেটের অন্তরালে বসে, মনে মনে সর্বদাই উদ্ঘাটিত হবার ভয়ে ভয়ে, তিনি তাঁর রচনাকার্য চালিয়ে যান।

হফম্যানের ধারণা মতে, এই পলায়ন পর্বের পরেই শুরু হয় প্রতারণা কাণ্ড: অর্থাৎ মারলোর তথাকথিত অপঘাত মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পূর্বে 'শেকসপীয়রের' সর্বপ্রথম রচনা 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস' স্টেশনার্স-এ রেজেস্ট্রি ভুক্ত হয় কোন গ্রন্থকারের নামবিহীন অবস্থাতেই।

এইভাবে চক্রান্তের অংশ বিশেষ হিসেবে শেকসপীয়র নামক স্বনামধন্য একজন অভিনেতার নামকে ব্যবহার করে পাদপ্রদীপের সম্মুখে নিয়ে আসা হল। ওয়ালসিংঘাম স্বয়ং মারলো লিখিত নাটক ও কবিতাবলীর মূল পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করিয়ে তাকে ফের পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। প্রকাশিত হতে লাগল শেকসপীয়রের নামে।

এটা কি খুবই অবিশ্বাস্য? হফম্যান দেখল ওয়ালসিংঘামের উইলে জনৈক 'নকলনবিস'কে কিছু দানপত্র করা হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগের প্রায় পঞ্চাশখানি উইল ঘেঁটে আর কোথাও 'নকলনবিস'কে দানপত্রের উল্লেখ হফম্যান পায় নি। তাহলে এই 'নকলনবিস'-এর

দ্বারাই কি মারলোর রচনাসমূহ কপি করান হয়েছিল? এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ১৫৯৮-এর পূর্বে অর্থাৎ 'লাভস লেবারস লস্ট' নাটকের টাইটেল পেজ-এর পূর্বে শেকসপীয়রের নাম কোন গ্রন্থেই মুদ্রিত হয় নি। গ্রন্থকর্তার এত বিলম্বে স্বীকৃতি পণ্ডিতদের ক্রমাগত হতবুদ্ধি করে এসেছে। আরও মনে রাখা দরকার যে মরণোত্তর প্রকাশিত 'ফাস্ট' ফোলিও'র অন্তর্গত ৩৬টি নাটকের মধ্যে ১৮টিই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে সেখানে। তবে কেন এই মৌনতা?

মারলোর নিরুদ্দিষ্ট হবার পর ইতালীয় ঘটনা সম্বলিত প্রথম নাটক দেখা দেয়, টু জেণ্টলমেন অফ ভেরোনা (১৫৯৪-৯৫)। টাইটাস অ্যাণ্ড্রনিকাস, হেনরী সিকসথ এবং রিচার্ড থার্ড, প্রত্যেকটি নাটকই মারলোর ইতিপূর্বে-লিখিত এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড এবং ট্যাম্বার লেইনের স্পষ্ট অনুকরণে লিখিত। তারপরই শুরু হল কমেডি এবং ট্র্যাজেডির বন্যা—যে বন্যা 'ফাস্ট' ফোলিও' প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশে গোপন ছিল।

১৫৯০-এর শেষাশেষি কোন সময়ে প্রখ্যাত সনেটগুলি অবশ্যই রচিত হয়। তাদের বিষয়বস্তুসমূহ চিরকালই শেকসপীয়র বিশেষজ্ঞদের কাছে অপ্রকাশ রহস্যই রয়ে গেছে। যদি ওগুলোকে রূপকভাবে ধরা যায় তাহলে কল্পনাকে হতবুদ্ধি করে। যদি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যায় তাহলে যেভাবে সমূহ প্রকটিত হয়ে ওঠে তাকে কোন মতেই পরিচিত শেকসপীয়রের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না।

তবে যদি হফ্‌ম্যানের থিয়োরীকে সমর্থন করা যায় তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরূপ। অন্য এক রহস্যময় কাহিনী উন্মোচিত হয় তার দ্বারা।

সে কাহিনীতে প্রকাশ পায়, ক্রাইম, অপরাধবোধ, নির্বাসন, প্রবঞ্চনা এবং হতাশা। ২৫ নং সনেটে কবি তাঁর ভাগ্য সম্পর্কে বিলাপ করেছেন। ২৬ নং সনেটে কবি বলেছেন তিনি তার মাথা দেখাতে সাহস পাচ্ছেন না। ২৭ নং সনেটে তিনি বহুদূরে প্রতীক্ষা করে থাকবেন বলেছেন। ২৮ নং সনেটে আছে তিনি 'বিশ্রামের সুবিধা থেকে বঞ্চিত'

হয়েছেন। ২৯ নং সনেটে তিনি তার 'সমাজচ্যুত অবস্থা'র জন্য ক্রন্দন করেছেন। ৩৬ নং সনেটে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করে বলেছেন :

'I may not evermore acknowledge thee
Lest my bewailed guilt should do thee shame,
Nor thou with Public kindness honour me,
Unless thou take that honour from thy name'

এখন এইসব বিলাপোক্তি ও আর্তনাদের অর্থ কি? বিশেষ করে সে-সময় বছরের পর বছর ধরে যে শেকসপীয়র লণ্ডনে সমৃদ্ধির চূড়ায় আরোহণ করে চলেছিলেন তার কলমে কি এ-সব মানায়? 'কবি কল্পনা' ছাড়া দ্বিতীয় কোন সদুত্তর কেউ এর স্বপক্ষে দিতে পারেন নি।

তাহলে অবশ্যই একথা মনে করার যুক্তি আছে যে মারলোই তার কষ্টজনক আরোপিত বেনামী-জীবনের একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে শেকসপীয়রের নামে তামাশা করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এইসব সনেট-রচনার মাধ্যমে।

এরপর পরম কৌতূহলে হফ্‌ম্যান লক্ষ্য করল যে যদিচ শেকসপীয়র প্রায় ১০০০টি চরিত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, তবু 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকেই শুধুমাত্র 'উইলিয়াম' নামক একটি চরিত্র রয়েছে। উইলিয়াম সাদাসিধে ধরনের এক মূর্খের চরিত্র। নিজ অজ্ঞানতার জন্য তাকে টাচস্টোনের কাছে বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। বেচারা উইলিয়ামের প্রতি টাচস্টোনের একটি উক্তিতে আছে :

'For all your writers do consent that ipse is he : now you are not ipse, for I am he.' (Ipse meaning I, myself)

কিন্তু এই টাচস্টোন-এর চেয়ে আরও কিছু উদ্দীপক বাক্য বলেছে অড্রে নাম্নী এক গ্রাম্য তরুণীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে :

'When a man's verses cannot be understood, nor a man's good wit seconded with the forward chid, understanding,

it strikes a man more dead than a great reckoning in a little room'

'Great reckoning in a little room' মারলোর মৃত্যুর ব্যাপারে এর চেয়ে সহজ সরল উল্লেখ আর কি হতে পারে? আর যখন 'কেউই' মারলোর মৃত্যুর সঠিক বিবরণ জানত না, শেকসপীয়রই বা তা জানলেন কি করে? উক্ত বিবৃতি বাদ দিলে ঐ লাইনটি তো পরিপূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

হফ্ম্যান এই ভাবে মারলো—শেকসপীয়র সাদৃশ্যের ১০০০ দৃষ্টান্ত সহ যে থিসিস লিখেছেন তাই একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ উনিশ বছরের অক্লান্ত গবেষণা চালিয়েছে সে।

—প্রায়ই ইচ্ছে হয়েছে ছেড়ে দিই এ কাজ, হফ্ম্যান বলেছে, আমি কঠোর পরিশ্রম সহকারে চেষ্টা করেছি ব্যাপারটা অপ্রমাণ করবার, কিন্তু যত দিন গেছে ততই আমার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে আমার থিওরীই নির্ভুল সত্য।

১৯৫৩ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একজন ছাত্র কেম্ব্রিজের কর্পাস ক্রিস্টি কলেজের ওল্ড কোর্টের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছিল। সহসা তার নজর পড়ে কতগুলো টুকরো টুকরো আলগা পাথরের স্তূপের মধ্য থেকে একটা রঙ করা কাঠ বেরিয়ে রয়েছে। ঐ রাবিশ সহ বস্তুটি বেরিয়েছে যে ঘর থেকে, সেই ঘরেই এককালে বসবাস করে গেছে স্বয়ং মারলো। সে সময় থেকে এই সর্বপ্রথম ঘরটির সংস্কার করা হচ্ছিল। কাঠের প্যানেলে দেখা গেল অঙ্কিত রয়েছে বিষণ্ণ-মুখ সংবেদনশীল এক যুবাপুরুষের আবক্ষ মূর্তি। এ ছবির এক কোণে ল্যাটিন ভাষায় লেখা রয়েছে: বয়েস ২১ আর সাল ১৫৮৫। তারই নিচে রয়েছে এই দু'লাইনের শ্লোক: 'Quod me nutrit, me destruit' (যা আমাকে পুষ্টিবিধান করে, তাই আমাকে ধ্বংস করে)।

কে হতে পারে এই যুবক? মারলো কেম্ব্রিজে ছিলেন ১৫৮৫-তে এবং তখন তাঁর বয়েস ছিল ২১ বছর। আর এই উদ্ধৃতি? এটা শেকসপীয়রের 'পেরিক্লিস'-এ দেখি পুনরুক্ত হয়েছে এইভাবে:

Quod me alit, me extinguit' (যাহা আমায় আলোকিত করে তাই আমাকে নিভিয়ে দেয়)। আবার ৭৩ নং সনেটে ইংরেজিতে উল্লিখিত হয়েছে এই ভাবে : Consumed with that which it was nourish'd by.'

যে মুহূর্তে আমি এই পোট্রে´ট দেখি, হফ্‌ম্যান বলে, তখন থেকেই এটা আমায় যেন তাড়া করে ফিরেছে। এ মুখ আমি ইতিপূর্বে কোথায় দেখেছি? সহসা মনে পড়ল। ফার্স্ট´ ফোলিওতে প্রকাশিত ড্রয়েসাউট (Droeshout) কর্তৃক এনগ্রেভ করা শেকসপীয়রের ছবি। অবশ্য আমার সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে ভেবে আমি সেই পোট্রে´ট ও এনগ্রেভিং ছবি একদল ইংরেজ পোট্রে´ট স্পেশালিস্টকে দেখাই। তারা প্রত্যেকে রায় দেন যে দুটি ছবিই একই ব্যক্তির মুখের।

শেষ আশা ছিল হফ্‌ম্যানের যে, শেকসপীয়রের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই (রচনাকাল থেকে 'ফার্স্ট´ ফোলিও'তে প্রকাশকাল পর্যন্ত) কারুর না কারুর কাছে অতি অবশ্যই সযত্নে রক্ষিত আছে। যদি সেই রক্ষক বলে ওয়ালসিংঘামকে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সেগুলি তিনি কি করেছেন? তবে কি তার উইলে উল্লিখিত মত একটা সিন্দুকের মধ্যে কবর দিয়েছেন?

হফ্‌ম্যান শেষ প্রচেষ্টা-স্বরূপ গেল বিশপ অফ রচেস্টার-এর কাছে। বিশদভাবে জানাল তার মনোবাসনা। বিশপ জানান যে এই ধরনের এক প্রয়োজনের জন্য ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের ডিন বছর পনের পূর্বে স্পেন্সারের টম্ব পুনর্বার খোলার আদেশ দিয়েছিলেন। তবে স্থানীয় ভিকার যদি অনুমতি দেন তো তাঁর কোন আপত্তি নেই।

স্থানীয় ভিকার ক্যানন লাম্ব মন দিয়ে শুনলেন হফ্‌ম্যানের বক্তব্য ও আরজি। সেখানে চার্চ কাউন্সিলের অপরাপর সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 'পবিত্রতা নষ্ট' হবে এই প্রশ্নে কবর উন্মোচন করা সম্ভব হল না।

এই ভাবেই ওয়ালসিংঘামের শেষ বিশ্রামস্থলের মুখে এসেই

হফ্ম্যানের অনুসন্ধানকার্য শুরু হয়ে গেল।

যদি টম্বনি খোলা হত তাহলে কি পাওয়া যেত? হফ্ম্যানের দৃঢ় অভিমত, কিছুই পাওয়া যেত না। তবে সম্ভবত একতাড়া দুমড়ানো কাগজ পাওয়া যেত, যার একটির মধ্যে হয়ত লেখা থাকত:

The Tragedie of Hamlet, Prince of Denmark

by

Christopher Marlowe

মুমতাজ ও এক মহারাজা

সেবার শুধু বোম্বে নয় সারা ভারতে চাঞ্চল্য আনলো বোম্বে হাইকোর্ট সেসনের সেই খুনের মামলাটি। যে মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হল ভারতখ্যাত আইনজীবী দেশপ্রিয় জে. এম সেনগুপ্তকে আর নিযুক্ত হলেন বোম্বে বার-এর প্রধান প্রখ্যাত ব্যারিস্টার এম. এল. জিন্না, যিনি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের পিতারূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

কি না ছিল এ মামলায়। রূপসী যুবতী নারী, সুন্দরী বয়স্কা বাঈজী, রাজা-মহারাজার কামলালসা, নারী অপহরণ প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষে গুণ্ডা নিয়োগে নরহত্যা পর্যন্ত।

'পাপের বেতন মৃত্যু' প্রবাদ বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে না ফললেও অনেকাংশে যে সংঘটিত হল এ কথা প্রমাণিত হয়েছে এই সুদীর্ঘ ঘটনা ও মামলার পরিণতিতে।

এই অভূতপূর্ব মামলা নিহিত কাহিনীর বীজ বপন করা হয়ে যায় এ শতাব্দীর প্রথম দশকে, যেদিন ফুলের মত অপরূপ সুন্দরী এক কন্যার জন্মদান করে ওয়াজির বেগম নামক রূপবতী এক বাঈজী।

এ বাঈজীর ঘরানা খুবই প্রসিদ্ধ। এরই বৃদ্ধ বৃদ্ধ-প্রপিতামহী ছিলেন রানী মোহরান। কথিত আছে, ইনি নাকি পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং-এর আনন্দ বর্ধন করে গিয়েছেন তাঁর যৌবনকালে।

ওয়াজির বেগমের আবাসনগর ছিল অমৃতসর। বিখ্যাত গাইয়ে ছিল সে, নাচিয়ে তো বটেই। এদের ঘরানা ওখানে খুবই প্রখ্যাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এই বেগম যুগ যুগ ধরে ধনাঢ্য নারী-লোলুপ, সংগীতরসিক, বহু অভিজাত মানুষ ও বণিক সম্প্রদায়কে নাচে গানে হাস্যে লাস্যে উপরন্তু অপরূপ দেহ-দানে তৃপ্ত করে এসেছে।

এই ভাবে রাত গেছে, দিন গেছে। মাস বছর কেটেছে তানপুরা, তবলা, সারেঙ্গী, ঘুঙুর ও মখমল-নরম সিল্কের বিছানায় সুরসিক পুরুষ-সঙ্গে উদ্বেলভাবে।

যৌবন চিরস্থায়ী নয়। যৌবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে উপস্থিত হয়। দেহপট সনে নট যেমন সকলি হারায়। দেহ উপ-জীবিনীদেরও তেমনি যৌবন সনে খদ্দেরের আগমন কমে আসে। বোলবোলাও অবস্থা স্তিমিত হয়ে যায়।

রসিক মানুষরা তো শুধু গান শুনতে আসে না। যত ভাল নাচ-গানই তুমি জানো, তোমার রূপ চাই, চাই দুরন্ত ভরা নদীর সরাসরি বানের মত যৌবন। অতএব নাচ-গানের চেয়েও আরও কিছু মহত্বর বাসনা নিয়েই হানা দেয় খদ্দেররা। সে খদ্দেরে ভাঁটা পড়ে বয়েস বেড়ে গেলে। রোজগার ধ প করে নেমে যায়।

ওয়াজির বেগমেরও তাই হল। তবে তার অন্য এক মূলধন শশী-কলার মত দিনে দিনে বেড়ে প্রস্তুত হচ্ছিল নিজ ঘরেই। সে ন ব যৌবন ছুঁই ছুঁই কি োরী কন্যা মুমতাজ। রূপও যেমন যৌবনও তেমনি যেন উপচে পড়ছে। সে কিশোরীর পানে বারেক তাকালে অনেক ইস্পাত-কঠোর ব্রহ্মচারী মানুষের দেহ অবশ হয়ে যায়।

শুধু রূপ নয়, ঘরানার গুণও সবকিছু পেয়েছে সে সুদক্ষ তালিম নিয়ে। মোহময় সুরেলা কণ্ঠে এসেছে প্রাণমাতানো গান, পায়ের ঘুঙুরে এনেছে উর্বশীর নৃত্যশীলতা। আর সহজাত দেহবল্লরী পেয়েছে কামনার অগ্নিঘেরা লালসা প্রধান।

কস্তুরী মৃগসম এই মেয়ে নিজের গন্ধে বুঝি নিজেই মাতোয়ারা। স্নানান্তে নিজ বিবসনা দেহসুষমা দীর্ঘ আয়নায় প্রতিফলিত দেখে নিজেই বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে অপার বিস্ময়ে। সুগন্ধী গোলাপ-জলে স্নান করা শরীর থেকে স্বর্গীয় গন্ধ বের হচ্ছে। দীর্ঘ কালো চুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা গোলাপজল ঝরে পড়ছে তখনো। নিখুঁত মুখাবয়ব, টিকলো নাক, দীর্ঘায়ত দুটি হরিণ নয়ন, দুধে আলতা গায়ের রঙ, চাঁপাকলির মত হাতের আঙুল, লালসাময় দুটি আর্দ্র ঠোঁট,

সরু কোমর, ভারী নিতম্ব, তন্বী ও মরালগ্রীবা। সবার উপরে দুটি পীনোন্নত অসাধারণ পয়োধর। দুটি হাতের তালু মেহেদী পাতার রঙে রাঙানো। বিলোল চাউনি, মদালসা লাস্যভাব, সারা দেহ ঘিরে এক দুর্নিবার আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। এ বুঝি সাক্ষাৎ এক লেলিহান অগ্নিকুণ্ড!

অতএব ঘৃতকুম্ভ সম সুরসিক সুজনেরা যে বিগলিত হয়ে জলবৎ হয়ে পড়বে এর সঙ্গলাভ করে, তাতে আর বিচিত্র কি! আয়নার পানে তাকিয়ে রূপ দর্শন করে নিজেরই যেন ঝিমঝিম লাগে মুমতাজের।

সহসা তার দেহাগ্নিতে পুড়ে মরা বহু ধরনের পিপীলিকা সম 'রইস' আদমীদের কথা স্মরণে এসে দেহভরা এক শিহরণে প্রচ্ছন্নভাবে কেঁপে ওঠে সে।

উঃ! এ বয়সেই কত না লোক এল। কত ধনাঢ্য স্বর্ণগর্ধভ কামাচারী পুরুষ। কত স্তরের মানুষ। সুদর্শন প্রিন্সরা, শ্মশ্রুমণ্ডিত জায়গিরদাররা, কিংবা নীল চোখ ইংরেজ পুরুষগণ। কত লোক আর কত বিচিত্র ও মহামূল্য উপহার সব! এই সব দেহলোলুপ মানুষেরা তার এই দেহের সৌজন্যে পায়ের কাছে ঢেলে দিয়েছে হীরা, মণি, মুক্তা, জহরৎ, সোনাদানা ও অজস্র রূপেয়া। বাড়ি গাড়ি কী নয়! শুধু একটু স্পর্শন, দর্শন, এবং… । কাউকে সে বঞ্চিত করেনি। ফেলো কড়ি মাখো তেল-এর বৃত্তান্ত। এখানে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, নেই কোন অন্তরে অন্তরে মিলন বিরহ মেলা, এখানে শুধু দেহসর্বস্ব পীরিতি আর ছলাকলা কৌশলের মারপ্যাঁচ।

এই সেই যৌবন ছুঁইছুঁই কিশোরী কন্যা মুমতাজ বেগমের রূপবর্ণন ও কার্যাবলীর বৃত্তান্ত।

সুখেই ছিল মা ওয়াজির ও মেয়ে মুমতাজ। অমৃতসরে বসে অমৃত বিলাচ্ছিল সুরসিক জনে জনে। ভাল খেলা খেলে যাচ্ছিল মেয়ে, নিখুঁত ইনিংস। মানুষের অর্থ ধন জীবন যৌবন সম্পত্তি বিনষ্টকারী এই রূপসী কন্যা মায়ের অপরূপ কণ্ঠ ও নিজ সহজাত দেহ নিয়ে রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল।

সুধাবর্ষণকারী উচ্‌' গজল ঠুংরী আর রাতুল চরণের বিঘূর্ণিত নূপুর নিক্কণে ওদের বাড়ি প্রতিরাত্রে জমজমাট হয়ে উঠত।

কিন্তু মুশকিল হল মানুষের মন নিয়ে। উচ্চাশার বুঝি শেষ নেই, আকাঙ্ক্ষারও নেই অন্ত। 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় যার আছে ভূরি ভূরি'। সেই মনোভাব দেখা দিল মা ওয়াজির বেগমের মনে।

অমৃতসরের গণ্ডি বড় ছোট। তার কন্যা রূপে-গুণে যৌন আবেদনে তাকে বহুলাংশে ছাড়িয়ে গেছে। গুরু মারা বিদ্যে আর কি। এ মেয়ের কদর এ নগণ্য শহর বুঝবে না। এখানকার আয় সীমিত। অতএব মা মেয়েকে নিয়ে চলে এল বিশাল ধনী রসিক জনাকীর্ণ বৃহৎ নগরী বোম্বেতে।

এখানে ঠিকই ব্যবসা আরও জমে উঠলো নাচে-গানে-দেহ মিলনে! কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'। ওয়াজির বেগমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও উচ্চে এভারেস্ট শিখরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। তার তৃপ্তি এখনো হবার নয়।

হীরের টুকরোর মতো তার মেয়ে এই ধরনের জনে জনে উঞ্ছবৃত্তি করে জীবন কাটাবে এটা তার আদৌ কাম্য নয়। তার দৃষ্টি রাজা-মহারাজার দিকে। সে রকম একজনকে গেঁথে না তুলতে পারলে এ জিন্দিগীতে শান্তি নেই।

দিকে দিকে ওয়াজিরের দালালেরা সেই ধান্ধায়ই ঘুরছিল দিগ্বিদিকে। নগরীর বড় বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্লাব ও অপরাপর প্রমোদাগারে তার চরেরা সুলুক সন্ধানে ছিল অহোরাত্র।

ওয়াজিরের মনোবাসনা ও স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হল অচিরেই। ওয়াজির দুগ্ধফেননিভ বিছানায় বসে দামী জর্দা পান চিবুতে চিবুতে বাঁদীর দ্বারা পায়ের তলায় পালকের সুড়সুড়ি খাচ্ছিল (এ প্রক্রিয়ায় নাকি বহুদিন যৌবন ধরে রাখা যায় এই ছিল তার বিশ্বাস)।

এমন সময় তার এক উল্লসিত দালাল সহাস্যে এসে এই দারুণ সুসংবাদটি দিল।

অ্যাঁ—বলো কি ! খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে বিরাট এক বকশিস করে বসলো দালাল লোকটিকে।

শোনা গেল রাজরাজেশ্বর সহায় শ্রীস্যার টুকোজী রাও হোলকার বাহাদুর, নাইট গ্র্যাণ্ড কমাণ্ডার অফ দ্য মোস্ট এক্সাল্টেড অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ইণ্ডিয়া, ইন্দোরের মহারাজা নাকি মুমতাজের রূপ-গুণের কথা লোকমুখে অবহিত হয়েছেন। এবং তিনি অনুগ্রহপূর্বক শুনতে চেয়েছেন এই খুবসুরৎ লেড়কী মুমতাজের গান ও নাচ।

সমস্ত অঙ্গ বেয়ে একটা আনন্দের উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল বয়স্কা রূপবতী বাঈজী ওয়াজিব বেগমের। উঃ এতদিনে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন। বহুদিনের তার সুপ্ত আশা আজ বুঝি পূর্ণ হতে চললো। তার দরজায় মহারাজের ধন-দৌলত যেন প্রায় ধাক্কা মারলো এসে। একে মহারাজা তায় আবার ইন্দোরের মহারাজা। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। এর বেশী আর মানুষ কি আশা করতে পারে ! না, সে এখন আকাঙ্ক্ষার এভারেস্ট শীর্ষে পৌঁছে গেল বলা যায়। কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।

এবারে কিছু পরিচয় নেওয়া যাক এই মহারাজা সম্বন্ধে।

স্যার টুকোজী রাও দু-দু'বার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এবং বয়সের দিক থেকেও যৌবনের তুঙ্গ অবস্থা অতিক্রান্ত সে সময়। দেহ কিঞ্চিৎ দুর্বল হলেও কামনা বাসনার দিক থেকে তার মন ছিল দুর্মদ। শুধু নৃপতি নয়, আজগুবী ধনী নৃপতি। তাঁর কত ধনসম্পত্তি তার হিসেব হয়ত তিনি নিজেও জানেন না। মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্য ইন্দোর তাঁকে বছরে সে যুগেই দু'কোটি টাকার উপর রেভিনিউ এনে দিত।

স্থান ও সময় নির্বাচিত হয়ে গেল মিলিত হবার। মহারাজার বম্বেস্থিত 'ইন্দোর হাউসে' এক সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হল ওয়াজির বেগম, মুমতাজ বেগম ও তাদের দালালটি।

রাজদরবারের মত জলসাঘরে একটি স্বর্ণখচিত চওড়া সোফায় বসে টুকোজী হুইস্কি পান করতে করতে দেহের সঙ্গে সেঁটে যাওয়া

আঁটোসাঁটো পোশাকে পালকের মত হালকা চালে নূপুর নিক্কণ সহকারে, মায়ের কোকিলকণ্ঠ সংগীতের ঢেউএ ঢেউএ চিত্ত-চমৎকারী নাচ নেচে যাওয়া যুবতীটিকে জুলজুল নেত্রে নিরীক্ষণ করছিলেন।

টু.কাজীর সুরামত্ত রক্তবর্ণ নয়ন গোগ্রাসে গিলছিল নৃত্যশীলা মুমতাজের অনবদ্য দেহ-সুষমা। যুবতীর নিতম্বের দোলানী, স্তনদ্বয়ের কম্পন ও মদালসা দৃষ্টি চাহনির ফলে মহারাজার শরীর যেন কামাগ্নিতে দাউদাউ করে প্রজ্বলিত হচ্ছিল।

রাজামশায়ের অভিজ্ঞতায় ঘাটতি ছিল না। জীবনে তিনি নারী চেয়েছেন এবং পেয়েছেনও প্রচুর। সাদা কালো লাল হলদে—বিভিন্ন জাতীয়া, যুবতীদেহের আস্বাদনের অভিজ্ঞতা তাঁর নিঃসীম। কিন্তু এই অগ্নিসমা হীরকদ্যুতি সম্পন্না ছলছল-যৌবনা মেয়েটি যেন সবার চেয়ে আলাদা, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

যত সময় যেতে লাগলো মহারাজার প্রতি অঙ্গ যুবতীর প্রতি অঙ্গের লাগি যেন হাহাকার করে উঠতে থাকলো। তার বয়েস-ভারাক্রান্ত বুড়া হাড়ে যেন এই নর্তকী ভেলকি খেলিয়ে ছাড়লো।

সেই রাতে, জলসা শেষে টুকোজীর কনফিডেনসিয়াল সেক্রেটারী ওয়াজির বেগমকে এই সুসংবাদটি দিল যে তার কন্যা মুমতাজ বেগম ইন্দোরের রাজনর্তকী হিসেবে নিযুক্ত হল লোভনীয় অঙ্কের মাস-মাহিনায়। তদুপরি ওয়াজির বেগম ও তার দলের অপরাপর লোকজনের জন্যেও উপাদেয় অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা মঞ্জুর করে দেন মেহেরবান মহারাজা।

এই ঘোষণা শ্রবণ করে মাতাসাহেবা যারপরনাই পুলকিত হল। অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে মা ও দালালটি গিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে বসলো।

মুমতাজ রয়ে গেল 'ইন্দোর হাউসে'। কিছু পরে সে টুকোজীর পেছন পেছন গিয়ে উপস্থিত হলো গন্ধ-ছড়ানো মোমবাতি জ্বলা রাজকীয় শোবার ঘরে। সেখানে একসময় রাজার লালসামত্ত হাত দুটি মুমতাজের ঘামে ভেজা পোশাকের বোতামাদি খুলতে তৎপর হয়ে উঠলো।

একটি সুইচ টিপতে শোবার ঘরের দরজা নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো সেই মোহমদির রাতে।

ইন্দোরে গিয়ে মুমতাজ মহারাজের রক্ষিতারূপে একটি ছোটখাট নিজস্ব প্রাসাদে মা এবং কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে অধিষ্ঠিত হলো। অপরূপা যুবতীর রূপযৌবনের কাছে মহারাজা প্রায় ক্রীতদাসের মত নিজেকে সমর্পিত করে ফেললেন। সরকারী মর্যাদা না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মুমতাজ হয়ে উঠলো প্রায় ইন্দোরের মহারানী। অন্ততঃ সে ধরনের আচার-ব্যবহারই পেতে লাগলো সে। তাকে এই নূতন পদমর্যাদায় আসীন করবার প্রয়োজনে তার নামও পালটে রাখা হলো কমলাবাঈ সাহেবা।

টাকার স্রোত বইতে লাগলো নদীর মত। প্রতি রাত্রে সোনা-দানা মণি-মুক্তার যে কোন একটা কিছু বর্ষিত হতে লাগলো প্রেজেণ্টেসান হিসেবে। দিবা-রাত্রি যেন অমৃতময় হয়ে উঠলো। রাত্রি-কালের আকাশও হয়ে উঠলো রামধনুরঙা। মুমতাজের পুলকানন্দের সীমা রইলো না। কয়েক জন্মের সম্পদ এখন তার মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে।

কিন্তু…মাতা সাহেবার "তবু ভরিল না চিত্ত"। ওয়াজির বেগমের উচ্চাশা আবার ফণা মেললো। না, না, ভাল লাগছে না, তার হীরের টুকরো যুবতী কন্যা কিনা রক্ষিতা বনে রইলো, এখনো পুরোপুরি মহারানীর সরকারী মর্যাদা পেল না। সে আবার কলকাঠি চালালো। কিন্তু তাতেও টুকোজীর মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না বা প্রভাব বিস্তার করলো না। একটা ডবকা ছুঁড়িকে শয্যাসঙ্গিনী করা এক ব্যাপার আর মহারানী করা অন্য কথা। একজন মহারাজার বিবাহ হলো রাষ্ট্রের ব্যাপার, সেখানে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা পছন্দ নির্বাচন-এর কোন মূল্য নেই। রাজবংশের পরিণয়াদি নির্ধারিত হয় রাজকীয় শলাপরামর্শে। তা ছাড়া বুড়ো কর্তাদের বাদ দিলেও লণ্ডনের বড় সায়েবদের অনুমোদন এ সব ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বিশেষ করে

কনে যেখানে মুসলমান এবং পেশায় নর্তকী ও বাঈজী।

সে যাই হোক, টুকোজীর এ মেয়েকে বিবাহের কোন প্রশ্নই আসে না। তিনি সে লাইনে চিন্তাও করেন নি। তা ছাড়া মুমতাজ নিজে যখন শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পরম তৃপ্তই আছে, আর সে এর চেয়ে কোন উচ্চাশা পোষণ করছে বলে মনে হয় না, তখন এ সব কথা ওঠে কেন!

ওই বুড়ী বাঈজীই যত ঝামেলা পাকাচ্ছে কুটনির মত। অতএব এই পথের কাঁটাকে ওদের মাইফেলের দৃশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়াই শ্রেয়ঃ স্থির করলেন টুকোজী। পরিণাম যা-ই হোক না কেন, মাকে সরিয়ে ফেলতে হবে মেয়ের কাছ থেকে।

সুতরাং অচিরেই রাজার ইচ্ছা কার্যকরী করবার জন্য চেলা-চামুণ্ডারা কাজে অবতীর্ণ হয়ে গেল। সুপরিকল্পিত অত্যন্ত গোপনতা রক্ষা করে খুবই সতর্কতার সঙ্গে এ কাজটি করতে হবে। কোনদিকে কোন ত্রুটি রাখা চলবে না।

গ্রীষ্মকালে টুকোজী বেশ কিছুকালের জন্যে বোম্বে চলে এলেন। সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মুমতাজ বেগমও এল, তা বলাই বাহুল্য। মহারাজা এবার এসে উঠলেন তাজমহল হোটেলের আরব সমুদ্রের দিকে মুখকরা এক রাজকীয় স্যুইটে।

মুমতাজ ও তার আত্মীয়স্বজনদের রাখা হল শহরের অপর প্রান্তের এক বিরাট বাংলো টাইপের বাড়িতে।

একদা কোন একজন চরের মারফৎ রাজার কানে এ বার্তাটি এল যে, মুমতাজকে রাজার শয্যাসঙ্গিনী থেকে সরিয়ে দেবার গোপন চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে তার মা। সঙ্গে সঙ্গে নীল রক্তে তুফান জাগলো এবং অবিলম্বে টুকোজী ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প নিলেন।

এক সন্ধ্যায় ইন্দোর প্যালেসের বাপুরাও নামক জনৈক কর্মী গিয়ে উপস্থিত হল মুমতাজের কাছে। রাজা নাকি বলে পাঠিয়েছেন, তিনি একটি সিনেমা হলের কাছে অপেক্ষা করছেন। মুমতাজ যেন

এখুনি চলে আসে, খুব ভাল একটি ছায়াছবি চলছে সেখানে, দুজনে মিলে তা দেখবে।

সাজসজ্জা করে মুমতাজ গাড়িতে উঠলো। গাড়ি ছেড়ে দিল দ্রুতবেগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুমতাজ দেখতে পেল যে গাড়ি কোন সিনেমা হলের দিকে না গিয়ে বোম্বে শহর ছাড়িয়ে কয়েক শ' মাইল দূরের ইন্দোরের পানে চলেছে।

ওয়াজির বেগম যখন জানতে পারলো এই কৌশলের কথা, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে ফেটে পড়বার দাখিল হল। দাঁড়াও এর কি বদলা নিতে হয় দেখাচ্ছি। কালক্ষয় না করে সে ঝটিতি বোম্বে পুলিশের কাছে এই বলে নালিশ করলো যে, বাপুরাও তার অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই। বাপুরাও গ্রেফতার হয়ে গেল। কিন্তু প্রমাণাভাবে মামলা ফেঁসে গেল। ক্রোধের বশে ওয়াজির বেগম ভুলে গিয়েছিল যে সে লড়াই করতে নেমেছে কিংবদন্তীসম ধনকুবের এক রাজার সঙ্গে, যার রাজনৈতিক প্রভাবও সাংঘাতিক।

ক'মাস বাদেই মুমতাজ অকস্মাৎ লণ্ডনাভিমুখে রওনা হয়ে গেল। মধুর ভ্রমণ, দেরি হলেও মধুচন্দ্রিমাই বটে। এ খবর পেয়ে মা ওয়াজির বেগম মেয়েকে রোখবার খুবই চেষ্টা করে বিফল হল। পুলিশ-পক্ষ থেকে একজন মহিলা গিয়ে জাহাজে মুমতাজের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ফিরে এসে জানালো, ছোটে বেগম সাহেবা স্বইচ্ছায়ই বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে, এখানে জোরজবরদস্তির কোন প্রশ্নই নেই।

মুমতাজ ও টুকোজী ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এ ঘুরে দামী সুরা ও সুস্বাদু খাদ্য ও মোহময় শয্যাবিহারের উদ্দামতায় দিন এবং রাতগুলিকে সাতরঙা করে কাটাতে লাগলো।

এদিকে দেশে চরম হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মা ওয়াজির বেগম মহম্মদ আলি নামক একজন ব্যক্তিকে সাদী করে সুখে-সচ্ছন্দে ঘর করতে আরম্ভ করলো।

দু' বছর পর আবার এ কাহিনীর পর্দা উঠলো। ওয়াজির বেগমের ইন্দোরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ এল। মুমতাজ নাকি গর্ভবতী। যে কোন মুহূর্তে সন্তান প্রসব করবে। মেয়ে নাকি আবদার জানিয়েছে যে এ অবস্থায় মা এসে যেন তার কাছে থাকে। আর এ প্রস্তাব মহারাজা কৃপা করে মঞ্জুরও করেছেন।

ওয়াজির বেগম গিয়ে স্তম্ভিত হল দেখে যে, তার কন্যা বাস্তবপক্ষে একপ্রকার বন্দিনী হয়েই মহা ঐশ্বর্যে কালাতিপাত করছে কেবলমাত্র প্লে-বয় মহারাজার কামবাসনা চরিতার্থ করবার বিনিময়ে। অথচ মনে মনে খিস্তি-খেউড় ও মুণ্ডপাত আর আক্রোশে নিজের আঙুল কামড়ানো ছাড়া মাতা বেগমের কিছু করবার জোও ছিল না।

যথাকালে একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মুমতাজ সে সন্তানের মুখও দেখতে পেল না। শুনলো সে নাকি মারা গেছে। শোকে দুঃখে নিদারুণ ভেঙে পড়লো সদ্য মা-হওয়া মুমতাজ। এতাবৎ যা কিছু দেহে মনে সে টুকোজীর জন্য করেছে সে সমস্তই এবারে রূপান্তরিত হল প্রবল ঘৃণায়। আর এর ফলেই ওয়াজির বেগমের সুবিধে হল মেয়ের মন রাজার বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে তোলবার, মন ভাঙাবার।

মুমতাজ রাজার কাছে প্রায়ই আরজি পেশ করতে লাগলো এই বলে যে, তাকে অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্যও যেন ইন্দোরের বাইরে পাঠাবার অনুমতি দেওয়া হয়।

রাজা সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করলেন না। হাতের পাখি হাতছাড়া হলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতে পারে। হোক না সে একবার ডিমপাড়া পাখি, তবু এখনো তার ফুরফুরে নরম পালকে অনেক স্বাদ বর্তমান।

কিন্তু মুমতাজ নাছোড়বান্দা। কান্নাকাটি অনুনয় বিনয়ে প্রায় পাগল করে তুললো, রাজাকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাজা অনুমতি দিলেন সামান্য ক'দিনের জন্য মুসৌরী ঘুরে আসবার। মা-সাহেবাও যেতে পারবে, তবে সঙ্গে চলনদার হিসেবে যাবে মূল নামক ইন্দোর রাজ্যের একজন সরকারী অফিসার।

মুসৌরী যাবার পথে মুমতাজ ও তার দলবল দিল্লী রওনা হয়ে গেল। দিল্লী পৌঁছে মুমতাজ ও ওয়াজিব বেগম বিস্মিত সুলকে জানালো, তারা এখন অমৃতসর গামী ট্রেনে উঠবে। সুল যদি ইচ্ছে করে সে একা গিয়ে দু'এক দিন মুসৌরী পাহাড়ে ছুটি উপভোগ করে আসতে পারে। তারা যাবে না। মহা বিপদে পড়ে সুল হুলস্থুল করলো বটে তবে কোন ফল দর্শালো না। এটা ইন্দোর নয়, এটা স্বয়ং রাজধানী দিল্লী।

পুলিশের সাহায্য চাইতে এ হাস্যকর প্রস্তাবে তারা অক্ষমতা জানালে। তাতে সুল দেশীয় রাজন্য প্রথায় রাগ দেখাতে, দিল্লী পুলিশ তাকে তার পিতৃপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়ে দিল।

ওয়াজির অমৃতসরে পৌঁছে তত্ত্বতল্লাশ শুরু করে দিল এমন কোন ধনাঢ্য মহাজনের যে তার কন্যাকে রাজার মতই ঐশ্বর্যে ভরিয়ে তুলে তার দেহ উপভোগ করতে পারবে।

সুল-এর মুখে এ দুঃসংবাদ শ্রবণ করে রাজা মুহূর্তে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি ভূমিতে মুহুর্মুহু পদাঘাত করতে করতে আদেশ দিলেন, যে করেই হোক তার বিশ্বাসঘাতিনী রক্ষিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবেই, তার জন্য প্রয়োজন হলে যে কোন ব্যবস্থায় তিনি পেছপাও নন।

বহু গরম গরম কায়দা কানুন করা হল। এমন কি গুণ্ডাশ্রেণীর সাহায্যও নেওয়া হল, কিন্তু মুমতাজ বড়, কঠিন ধরনের পাখি, তাকে পুনরায় খাঁচায় আবদ্ধ হতে রাজী করানো কিছুতেই সম্ভব হল না।

মুমতাজ অমৃতসরে ফের ব্যবসা ফেঁদে ফেলে দেখলো এখানে শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রচুর খদ্দের থাকলেও প্রচুর অর্থ আমদানি নেই। তাই সে পুনরায় বোম্বে যাওয়ার সংকল্প করলো।

বাড়ির কর্তা অলস প্রকৃতির মানুষ মহম্মদ আলির অমৃতসরে বহু বন্ধুবান্ধব ছিল। তার মধ্যে বিহারীলাল নামে একজন ধনী বন্ধু ছিল। এর এক ভাই নামকরা ব্যারিস্টার, আর এক ভাই বোম্বে-বরোদা ও

সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়র বুলাকিদাস, যাঁর হেড কোয়ার্টার ছিল বোম্বে।

বিহারীলাল ওয়াজির ও মুমতাজ উভয়েরই সবিশেষ পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। সে ওদের বোম্বে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে রাজী হল। প্রভাবশালী মানুষ সে। বোম্বেতে একটি উপযুক্ত বাংলো ভাড়া করে দিল। ট্রেন বোম্বে পৌঁছলে ভাই বুলাকিদাস ওদের নিয়ে সে বাংলোতে অধিষ্ঠিত করে দিল।

চমৎকার বাংলো। কিন্তু অন্য এক ব্যাপার দেখে শুনে মুমতাজ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। বড় নির্জন নিরালা স্থানে বাংলোটি অবস্থিত, আশেপাশে বাড়ি-ঘর খুবই বিরল। এর ওপর নজর করলো সন্দেহজনক মানুষজনেরা তার বাংলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়. মাঝে মাঝে কি যেন গোপন ফিসফাস করে তাদের নিযুক্ত বাড়ির চাকর-বাকরদের সঙ্গে। একদা ঐ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করা লোকদের মধ্যে টুকোজীর এক কর্মীকে দেখে আতঙ্কে তার রক্ত জমে গেল সহসা।

মা-কে সে একথা জানালো। এবার উভয়েই বুঝতে পারলো সমস্তটাই একটা ফাঁদ। এই ফাঁদের মধ্যেই তারা পা দিয়েছে। এই বিহারীলাল, বাংলো, চাকর-বাকর, সবই টুকোজীর ক্রীড়নক পুতুলমাত্র। এরাই মুমতাজকে ইন্দোরে নিয়ে যাবার জন্য অজ্ঞাতে জাল পেতেছে।

তৎক্ষণাৎ ওয়াজির তার একদা বন্ধুস্থানীয় বোম্বে পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ফুলারের শরণাপন্ন হল। তিনি ওদের অবিলম্বে ঐ বাংলো ত্যাগ করে নিরাপদ অঞ্চলে চলে যেতে উপদেশ দিলেন।

অচিরেই এই নর্তকী পরিবারে গিয়ে উঠলো বোম্বের এক জন-বহুল অঞ্চলে।

টুকোজী ও তাঁর গুণ্ডা দলের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মুমতাজ ও ওয়াজির এবারে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে যারপরনাই তৎপর হয়ে উঠলো। ধনাঢ্য রসিক পুরুষের সন্ধানে চরকির মত তারা

ওরা বোম্বে শহর চষে ফেলতে লাগলো।

ওয়াজিরের দূরসম্পর্কের ভাই ছিল ট্যাক্সি ড্রাইভার আল্লাবক্স। স্বভাবতঃই সে বোম্বের বাঘা বাঘা চরিত্রহীনদের সুলুক-সন্ধান জানতো।

গ্রীষ্মের এক রাতে সে বোম্বের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিকে গাড়ি চালিয়ে এনে হাজির করলো ওদের জলসাঘরে। নারী-লোলুপ এই ভদ্রলোক রাজনৈতিক প্রভাবশালী প্রগ্রেসিভ পার্টির একজন পাণ্ডা এবং নগরীর কাউন্সিলারও বটেন। ভদ্রলোকের নাম আবদুল কাদের বাওলা। মধ্যবয়স্ক কোটিপতির পক্ষে মুমতাজের দেহমনে প্রবেশাধিকার লাভ করা খুব কঠিন হল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল গলা জড়িয়ে মুমতাজ তার নতুন দয়িতকে নিজহাতে আঙুর খাওয়াচ্ছে, অপরদিকে তখন বাওলা সাহেবের আপন হাত যুবতীর নানা অঙ্গে বিচরণ করে ফেরবার উদ্যোগী হয়েছে।

নতুন জুটি মহানন্দে এরপর যত্রতত্র ভ্রমণ ও পিকনিক, আহার পানীয় অন্তে শয্যাগ্রহণের দ্বারা মধুরভাবে কালাতিপাত করে চললো।

যখন মুমতাজের দেহেমনে স্বর্গীয় আনন্দলহরী পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রবহমান, এমন সময় আবার এক মহাবিপত্তি দেখা দিল।

বাড়ির এক ভৃত্য যার নাম রামলাল, এক রাত্রে দেখা গেল সে চুপি-চুপি গৃহত্যাগের তাল করছে। মহম্মদ আলি ধরে ফেলে তার বিছানা তল্লাশী করে পেল খাম ভর্তি বেশ কিছু টাকা ও ইদানীং হারিয়ে যাওয়া কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র। জেরার উত্তরে সে কিন্তু কোন কথাই বললো না।

পুলিশে দিতে তাদের কাছে রামলাল কতগুলো চমকে যাবার মত স্বীকারোক্তি করলো। আসলে সে একজন টুকোজীর বেতনভোগী চর, কৌশলে এ বাড়িতে ভৃত্যের চাকরি নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছে। একজন শ্রীরাম নামীয় ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে বড় একটি দল মুমতাজকে কিডন্যাপ করে নিয়ে মহারাজার হাতে সমর্পণ করবার জন্য নিযুক্ত

হয়েছে। মহারাজা তাদের কার্যে সফল হলে খরচ-খরচা বাদে ৩০,০০০ টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। আরও প্রকাশ পেল, স্বয়ং ওয়াজির বেগমের এক ভগ্নী এই চক্রান্তের মধ্যে সরাসরি যুক্ত রয়েছে।

এই ধরনের হাতে-নাতে ধরা গরম গরম তথ্যাদি সত্ত্বেও কিন্তু কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হল না, যেহেতু এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছেন একজন মহাপ্রতাপান্বিত দেশীয় রাজন। মুমতাজকে ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকতে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার রইল না।

এবারে আরবসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল চৌপাট্টিতে বিলাসবহুল এক ফ্ল্যাটে এসে উঠলো মুমতাজ ও তার সম্প্রদায়।

সবই বাওলা সাহেবের সৌজন্যে লাভ হল। সুন্দর ফ্ল্যাট, একটি সুন্দর আমেরিকান লিমোসিন গাড়ি, মহামূল্য পোশাক-আশাক, জড়োয়া গয়না এবং অজস্র অর্থ, যে অর্থে একমাত্র সুখ ছাড়া দুনিয়া সব কিছুই কেনা যায়।

এক শীতের সন্ধ্যায় মুমতাজ ও বাওলা তাদের দৈনন্দিন অভ্যেসমত গাড়ি করে প্রমোদ ভ্রমণে বেড়িয়েছে, দুজনেই প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ। বাওলার আত্মশ্লাঘা চরমে উঠেতে তার বক্ষলগ্না কিনা এমন এক রূপসী যুবতী সে কিনা এককালে এক মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল।

শহরের রাস্তার দিকে অগ্রসর হতে আলিঙ্গন শিথিল হয়ে দুজনেই ভদ্রভাবে সরে বসলো। সহসা শোফারের পাশে বসা বাওলার ম্যানেজার ম্যাথুজ মালিকের একটি আদেশ শুনে প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। এতক্ষণ সে ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসেছিল আর মনে মনে প্রার্থনা করেছিল আহা, তার মাথার পেছনে যদি দুটি গোপন চক্ষু থাকতো, তাহলে কত মজার দৃশ্যই না নয়নগোচর হত। মালিকের আদেশ হল, তাদের সঙ্গে পেছনের সিট-এ এসে বসতে। এ আদেশ কেন হল ঈশ্বর জানেন। ম্যাথুজ এসে পেছনে

এক পাশে বসলো। দু'পাশে দুই পুরুষ মাঝখানে মুমতাজ স্যাণ্ডুইচের মত বসে রইল।

মালাবার হিল-এর হ্যাঙ্গিং ব্রীজের কাছে ওদের গাড়ি আসতেই, সামনে পথরোধ করে দাঁড়ালো আরেকটি গাড়ি। শোফার জোরে ব্রেক কষে মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলো ব্যাপারখানা কি?

আগন্তুক ম্যাক্সওয়েল গাড়ি থেকে ছুরি ও পিস্তল হাতে পাঁচ ব্যক্তি ঝটিতি নেমে ওদের আক্রমণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

প্রথম প্রচণ্ড আঘাতটি খেল শোফার তার মাথায়। লুটিয়ে পড়ে গেল মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে। প্রবলভাবে টেনে হিঁচড়ে মুমতাজকে নামানো হল গাড়ি থেকে। সে বাধা দেবার চেষ্টা করতে একজন দুর্বৃত্ত ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে দিল। বাওলা তার সহচরীকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল গর্জে উঠলো, বহু বুলেট বিদ্ধ হয়ে বাওলা গাড়ি থেকে নীচে পড়ে গেল রক্তাক্ত হয়ে। এই গোলমালের মুখে ম্যাথুজ পালাবার চেষ্টা করতে সেও আহত হল।

যখন গুলির শব্দ, আর্তনাদ, গোঙানি ও চিৎকার রাত্রির অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছিল সে সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল আরেকটি গাড়ি। তাতে ছিল তিনজন সামরিক অফিসার। লেঃ সার্জেন্ট, লেঃ বেটলি ও লেঃ স্টিভেন্স। তারা গল্‌ফ খেলে বাড়ি ফিরছিল। তাদের গল্‌ফস্টিক ও গদা দিয়ে তারা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুমতাজকে রক্ষা করলো এবং দুর্বৃত্তদের একজনকে পাকড়াও করে ফেললো। পরমুহূর্তে অপর এক গাড়িতে আরেকজন অফিসার কর্নেল ভিকার্সও সেখানে এসে পড়ে উদ্ধারকার্যে যোগ দিল।

অন্ধকারের সুযোগে একজন ছাড়া অপর সব দুর্বৃত্তগণ গাড়ি নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পুলিশ দ্রুত অকুস্থলে এসে একমাত্র আসামীকে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে গেল। গুরুতরভাবে আহত বাওলা পরদিন হাসপাতালে মারা যায়।

কোটিপতি রাজনীতিকের হত্যাকাণ্ডে বোম্বে শহর চরম উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যে সরগরম হয়ে উঠলো। সিটি পুলিশের পুরো দল আসামী

সন্ধানে ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়ে উঠলো। সামরিক অফিসার লেঃ সার্জেণ্ট কর্তৃক ধৃত দুর্বৃত্তের নাম শফী আহমেদ। সে ইন্দোর স্টেট পুলিশের একজন অফিসার বলে প্রমাণিত হল।

আবার টুকোজীর প্রসঙ্গ উঠলো। বহু সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর নয়জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অপহরণ ও নর-হত্যার অভিযোগে চার্জ গ্রহণ করা হল।

অভিযুক্তরা হল—ইন্দোর পুলিসের শফী আহমেদ, টুকোজীর অ্যাসিস্টেণ্ট এডিসি পি. বি. পাণ্ডে, ইন্দোরের এক ড্রাইভার বাহাদুর শাহ, ইন্দোরের এক অধিবাসী আকবর শাহ, ইন্দোর এয়ার-ফোর্সের এস. আর. দুর্ঘে, ইন্দোর পুলিশের মুমতাজ মহম্মদ, ইন্দোরের এক ট্রাক ড্রাইভার আবদুল মইউদ্দীন, ইন্দোর ল্যান্সার্স-এর কেরামৎ খাঁ এবং ইন্দোর ফোর্সের অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেল এ. জি. ফান্সে।

এরা সবাই ই-হল মহারাজা কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি, যাদের বলা হয়েছিল জানপ্রাণ কবুল করে হলেও ঐ মুমতাজ মেয়েটাকে অপহরণ কার নিয়ে এসে তাঁর কামনা চরিতার্থের জন্য শয্যায় তুলে দিতে।

বিরাট ও চাঞ্চল্যকর মামলা উঠলো বোম্বে হাইকোর্ট সেসনে। সেখানে অন্যান্যের সঙ্গে আসামী পক্ষের আইনজীবী নিযুক্ত হয়ে-ছিলেন, দেশপ্রিয় জে. এম সেনগুপ্ত এবং পাকিস্তান-জনক মহম্মদ আলি জিন্না।

দুজন খালাস পেল। বাদবাকীদের মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত দণ্ডাদেশ হল।

আপীল হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে। সেখানে প্রখ্যাত আইনবিশারদ স্যার জন সাইমন আসামী পক্ষের হয়ে বহু যুক্তিতর্কের ঝড় বইয়ে দিলেন। তবুও আসামীরা কেউ রেহাই পেল না। ফান্সের মৃত্যু দণ্ডাদেশ শুধু রহিত হয়ে গেল মাত্র।

১৯২৫-এর নভেম্বরে সফী ও দুর্ঘের ফাঁসি হয়ে গেল। পাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া গেল না, কেন না সে আপীল ডিসমিস হবার পরেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়।

নাটের গুরু টুকোজীর কি হল ? কি আর হবে, তাঁর পদমর্যাদা ও অর্থের সৌজন্যে তিনি এই মামলা থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন।

নানা আন্দোলনের ফলে বিলেতের লর্ড রীডিং টুকোজীকে দুটি শর্ত দিলেন, এক হল একটি এনকোয়ারির সম্মুখীন হওয়া, নয়ত সিংহাসন ত্যাগ করা। চতুর রাজা শেষেরটিই বেছে নিলেন। ছেলেকে বসিয়ে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে আমেরিকা ভ্রমণে চলে গেলেন। সেখানে মজা লুটতে গেলে এত হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। খুন জখম অপহরণ নেই, সুরা ও নারীর স্রোত সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে যায়।

আর নায়িকার সংবাদ ? মুমতাজ এরপর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হল বারেক। স্বামী হারিয়ে হলিউড চলে গেল যশ ও অর্থ লালসায়। হলিউড থেকে পরিত্যক্ত হয়ে দুঃখ ও হতাশায় বিষাদময়ী এক নারী-রূপে ফিরে এল দেশে। বাওলার ঔরসে তার যে কন্যা হয়ে ছিল তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হয়ত আরও উদ্বিগ্ন হয়েছিল সে। কেন না নতুন ভারতবর্ষে তো আর মহারাজও নেই, নেই কোন নবাব বাহাদুরেরাও।

জ্যাক দি রিপার

সেটা ছিল লণ্ডনের ফগ আচ্ছাদিত এক ধোঁয়াটে রাত। অঞ্চলটিও তেমনি কুখ্যাত। গণিকা অধ্যুষিত ইস্ট এণ্ড-এর হোয়াইট চ্যাপেল পল্লী। কুয়াশার মধ্য দিয়ে একটি লোকের ছায়ামূর্তি যেন পিছলে পিছলে পথ চলছিল। টহলদারী পুলিশ দেখেই সে ত্রস্তে লুকিয়ে পড়ছিল কোন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনায়। অকস্মাৎ দেখা গেল লোকটার গতি হল দ্রুত, হয়তো বা তার হৃদ্‌স্পন্দনও। চোখের পলকে সে ঢুকে পড়ল ডানদিকের বক্‌স্ রো-র ক্ষুদ্র এক গলিতে। অতঃপর নিঃশব্দ পায়ে সে একটা বাড়ির অন্ধকার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং শিকারী বেড়ালের মত সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই গুপ্ত অন্ধকার স্থান থেকে লোকটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিপাতে দেখতে পাচ্ছে না চলমান মানুষজনকে। শ্লথ গতিতে চলা নরনারী, কখনও শুধু নারী। তার বিকৃত চিন্তায় তখন একটি দৃশ্যই বুঝি ভেসে উঠছিল। পায়ের কাছে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে ভয়ংকর ভাবে ক্ষতবিক্ষতা ভূলুণ্ঠিতা, রক্তঝরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারী-মূর্তি। এক কল্পচিন্তাকালে তার মুখভাব বীভৎস উল্লাসে উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

রাত ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভোরের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। বিপুলকায় বিগ বেন ঘড়ি সময়ের নির্দেশ দিয়ে চলেছে ডিং ডং আওয়াজে। লোকটা তেমনি ভাবে অপেক্ষা করে আছে, বলা যায় ওঁৎ পেতে রয়েছে অসীম ধৈর্য। রাত একটা......দুটো...তিনটেও বেজে গেল ক্রমে। তারপর সহসা সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে বনবিড়ালের ক্ষিপ্রতায় যেন লাফিয়ে উঠল মানুষটা।

রাত তখন ঠিক ৩টে ৪৫ মিনিট। তারিখটা ছিল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট। ঠিক সেই মুহূর্তে ইতিহাসের জঘন্যতম খুনী 'জ্যাক দি রিপার' পুনরায় এক নৃশংস আঘাত হানল।

মাত্র কয়েক মিনিটের ঘটনা। তন্মুহূর্তে একজন টহলদার পুলিশ

সেই গলিপথে এসে পড়েছিল। তার শুধু নজরে পড়ল একটি স্ত্রীলোক অন্ধকার রাস্তায় শুয়ে পড়ে আছে। সঙ্গত কারণেই সে ভাবল, এ একজন রাস্তায় ঘোরা গণিকা মাত্র। অত্যধিক মদ্যপানে হয়তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে।

সে ত্রস্তে এগিয়ে গিয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরে তুলতে গেল। পরক্ষণেই ভয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। পড়ে থাকা মেয়েটার সর্বদেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। মেয়েটার দেহ নেতিয়ে গেছে বটে, তবে শরীর তখনও তার উষ্ণ রয়েছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে পুলিশটি লক্ষ্য করল মেয়েটির স্কার্টটি কোমর অবধি তোলা, তলায় কোন অন্তর্বাস নেই, সুপুষ্ট শ্বেতশুভ্র দুটি জঙ্ঘা স্বল্পালোকে উন্মুক্ত। নারীটির নিম্নাঙ্গের সর্বত্র প্রচুর ছুরিকাঘাতের চিহ্ন। দেহে প্রাণ নেই। গলাটি তার এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত ফালি কাটা। পুলিশটি মেয়েটিকে তুলতে যেতেই তার মুণ্ডটি অতি নগণ্য সূত্রে পিছন দিকে ঝুলে পড়ল।

নিপুণ হাতে এত বড় একটা বীভৎস খুন, এতগুলো ভয়াবহ আঘাত করা, অথচ আশ্চর্য যে আশেপাশের বাড়ির কেউ কোন প্রকার এতটুকু শব্দ পায়নি বা শোনেনি কোন ধস্তাধস্তির আওয়াজ কিংবা কানে আসেনি বিন্দুমাত্র আর্তনাদ। পুলিশ অফিসারের বুঝতে বাকি রইল না যে নিহত রমণী অবশ্যই এক দেহপসারিণী। হয়তো লাইনে নবাগতাই হবে। দরদস্তুর শেষে অকুস্থলেই হয়তো সে শয্যাগ্রহণ করেছিল দেহদান মানসে। আর সেই অবস্থাতেই ঘাতকের ছুরি নেমে এসেছে...। না হলে এমন নিখুঁত নারীহত্যার আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে। অসাধারণ শীতল মস্তিষ্ক সম্পন্ন পাকা ওস্তাদ সেই কসাই একটি আঘাতেই মেয়েটির গলা কাটা শেষ করেছে। অতঃপর ক্ষ্যাপার মত গণিকাটির নিম্নাঙ্গে পুনঃপুনঃ ছুরিকাঘাত করে গেছে।

পুলিশটির হাঁকডাকে পাড়া জেগে উঠল। ঘটনা দেখে স্তম্ভিত আতঙ্কে সবার মনেই এক চিন্তা, এক কথা—কী ধরনের দানব এই অজানা অচেনা হত্যাকারী! চকিতে এই লোমহর্ষণ সংবাদ সারা লণ্ডনে

ছড়িয়ে পড়ল। সর্বনাশ! জ্যাক-দি-রিপার আবার চরম আঘাত হেনেছে।

এবারকার নিহত গণিকাটির নাম মেরী অ্যান নিকোলস্।

আশ্চর্য কাণ্ড কেউ জানে না এই রিপার-এর আসল নাম বা সঠিক পরিচয়। জানে না সে কোন্ দেশের মানুষ। তার চেহারারও বিশেষ কোন বর্ণনা এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ঐ হত্যাকারীর এইসব হত্যাকাণ্ডের মোটিভ বা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই বা কি সেটাও হদিস করা যাচ্ছে না। সে কোন বস্তু অপহরণ করছে না, শুধুই নিছক হত্যা করে চলেছে।

তবে কি সে একজন সেক্স ম্যানিয়াক (যৌনোন্মাদ) ? নাকি শুধু একজন স্যাডিস্ট, যে নাকি নারীদেহ ছুরিকাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে অপার আনন্দ লাভ করে ?

মাঝে মাঝেই সে একই ধরনের বীভৎস নারীহত্যা করে যাচ্ছিল। সর্বসাকুল্যে অনেকগুলিই। তারপর এক সময় সে সহসা একেবারে নীরব হয়ে গেল। এরই বা রহস্য কি ? কোথায় গেল সে ? মোটমাট একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল জ্যাক-দি-রিপার।

এটাই বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীতে এক চরম অনুদ্ঘাটিত রহস্য বিশেষ।

পূর্ববর্ণিত ঘটনাটি তৃতীয় নারীহত্যা। প্রথমটি ছিল একই এলাকায় এম্মা এলিজাবেথ স্মিথ নাম্নী অপর এক ভ্রষ্টা নারী। ঐ বছরেরই ৩রা এপ্রিল শেষ রাত্তিরে তাকেও বীভৎসভাবে হত্যা করা হয় একই কুখ্যাত অঞ্চলে। মৃত্যুর পূর্বে এম্মা অসংলগ্ন ভাবে কিছু বলে যায়, কিন্তু তা থেকে হত্যাকারীর সন্ধান বা শনাক্তকরণে আদৌ কোন সাহায্য হয়নি।

দ্বিতীয় নারীটির নাম মার্থা ট্যারবাস। ৭ই আগস্ট তারিখে একটি না দুটি না পুরো ৩৯টি ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা করা হয় সেই বক্স্ রো-তেই। যেখানে মৃত্যুর পক্ষে একটি আঘাতই যথেষ্ট ছিল সেখানে এতগুলি আঘাতের ঘটনায় মনে হয় হত্যাকারী একজন সাংঘাতিক হিংস্র উন্মাদ।

চতুর্থ যে গণিকাটি নিহত হল তার নাম অ্যানি চ্যাপম্যান। এ মেয়েটিও পূর্বোল্লিখিতদের মতই নাম লেখানো গণিকা নয়। যাকে বলে 'ঘুসকি', তাই। তার স্বামী ছিল। কিন্তু অত্যধিক মদ্যাসক্ত মেয়েমানুষ ছিল সে। কখনও অর্থের বিনিময়ে কখনও বা স্রেফ একটু মদ্যপানের বিনিময়ে সে অক্লেশে দেহ দান করে বেড়াত। একেও অতীব নিপুণ শল্য-চিকিৎসকের মত অপারেশনের কায়দায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে রিপার।

অভাবিত কাণ্ড। শেষ রাত হলেও অত্যন্ত জনবহুল এলাকায় নিশ্চুপে নিঃশব্দে এভাবে মানুষ মারা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। শুধু হত্যা নয়, তাকে বিশদ ভাবে চেরাই ফাড়াই করাও এক তাজ্জব ঘটনা। অ্যানির টাকা পয়সা আংটি ঘড়ি কিছুই খোয়া যায়নি—দেহে পাওয়া যায়নি কোন ধর্ষণের চিহ্ন। অবশ্য সে হারিয়েছে একটি বড় বস্তুই। তার নিম্নাঙ্গ থেকে তার জরায়ুটিকে নিখুঁত ভাবে কেটে বের করে নিয়ে গেছে সেই অজ্ঞাত ঘাতক। অতএব পুলিশের ধারণা হল, খুনীটি হয় নিপুণ সার্জন নয়তো কোন পাকাপোক্ত কসাই।

লণ্ডনবাসীদের মনে একটি ধারণা খুব প্রবল হয়ে উঠল, তা হল কোন ইংরেজ এমন জঘন্য কাজ কিছুতেই করতে পারে না। এ অবধারিত একজন বিদেশী ঘাতক। কুখ্যাত অঞ্চলে নানা ধরনের বিদেশী কসাই ও সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষের গতায়াত ও বসবাস। অতএব এই ভয়ংকর খুনী হয় রাশিয়ান, নয়তো ফরাসী, অথবা প্রুশিয়ান বা ইটালিয়ান কিংবা কোন ইয়াঙ্কী হওয়াও বিচিত্র নয়।

এই রকম সংশয়ান্বিত ধারণাই গেঁথে গেল স্থানীয় জনসাধারণের মনে।

বলা বাহুল্য দুর্ধর্ষ পুলিশ বিভাগ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও তৎপর হয়ে উঠল। নানা গুজব, রাশি রাশি সত্য মিথ্যা সংবাদ পৌঁছতে লাগল পুলিশ দপ্তরে। কিন্তু কোন সঠিক হদিস মিলল না কিছুতেই। কে ও কি ধরনের খুনী সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটি, যে কিনা সহজলভ্য পাকা বেশ্যাদের গায়ে হাত তুলছে না, হত্যা করে চলেছে কেবল হাফ-গেরস্ত

ভ্রষ্টাদের। কোন এক ধর্মান্ধ উন্মাদ বেশ্যাবৃত্তি খতম করবার মানসে এই ঘৃণ্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের মতবাদও অগ্রাহ্য হয়ে গেল এ ব্যাপারে।

জনৈক প্রাবন্ধিক তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ করতে চাইলেন যে এই খুনী আদৌ কোন পুরুষ মানুষ নয়। এ হল একজন ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ রমণী। রাত-বিরেতে পেশার প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে তাকে যাতায়াত করতে হয়। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে তার পক্ষেই এ কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে কি খুনীটি 'জ্যাক' না হয়ে 'জেন-দি রিপার'?

এরপর ঘটনার চমক শতগুণে বাড়ল যখন দেখা গেল ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে এক ঘণ্টারও কম সময়ের ব্যবধানে জ্যাক-দি-রিপার ডবল খুন করে বসল।

বলা বাহুল্য এই দুজনও গণিকাই। একজনের নাম এলিজাবেথ সংলিজ, আর অপরজনের নাম ক্যাথারিন এডোজ। প্রথমটিকে হত্যা করা হল সোসালিস্ট সভ্যদের জমায়েতের জনাকীর্ণ এক জমজমাট রাত্রে। অতি নিকটে এত লোক, এত হট্টগোল, কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না কিছু।

মৃতদেহ আবিষ্কারের মুহূর্ত পর্যন্ত স্ত্রীলোকটির দেহ থেকে উষ্ণ রক্ত ঝরছিল—সেই একই প্রক্রিয়ায় একই ভাবে গলাকাটা, সেই নিম্নাঙ্গ ছুরিকাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ার দেহাংশবিশেষ নিয়ে গেছে 'রিপার'। এবার নিয়ে গেছে কিডনী। পঞ্চম ও ষষ্ঠ নারীহত্যা এই ভাবে সমাধা হল।

অকল্পনীয় আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল সারা লণ্ডনবাসীদের মনে। সন্ধের পর ঘরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হল ঐ এলাকায়। বিশেষ করে মেয়েরা, তা ভদ্রই হোক আর অভদ্রই হোক, চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ানো বন্ধ করে দিল।

হোয়াইট চ্যাপেল ও পার্শ্ববর্তী স্পিটাফিল অঞ্চলের ভদ্র কিছু ধনী ও অভিজাত মহিলা একযোগে শেষপর্যন্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সমীপে লিখিত আবেদনে এই আর্জি জানালো যে তিনি যেন অনুগ্রহ

করে যাবতীয় গণিকালয় অবিলম্বে বন্ধ করার আদেশ দেন।

এদিকে ভিজিলেন্স কমিটি গঠন হয়ে গেল। ইস্ট-এণ্ড অঞ্চলে টহলদারী পুলিশ প্রহরীর সংখ্যা প্রথমে দ্বিগুণ, পরে তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হল।

শোনা গেল, অনেকে নাকি 'জ্যাক'কে বলতে গেলে প্রায় দেখেই ফেলেছে। কিছু লোক আবার নাকি সামান্যের জন্যে তাকে দেখতে পায়নি।

অনেক তথাকথিত প্রায়-প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে জ্যাক-দি-রিপার নাকি অনতিদীর্ঘ ছিপছিপে ধরেনের মাঝবয়সী মানুষ। হাতে থাকে তার ডাক্তারদের মত একটা চামড়ার ব্যাগ। মাথায় উঁচু সিল্কের হ্যাট। একটা বিষয়ে সবাই একমত যে লোকটার কথাবার্তায় নাকি বিদেশী টান রয়েছে।

অদ্ভুত রহস্যজনক ভাবে খুনের পর খুন হয়ে যাচ্ছে অথচ কোন কিনারা করা যাচ্ছে না, তাই সঙ্গত কারণেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড একটু বিচলিত। শেষ অবধি তারা জনগণের চাপে পড়ে অভিনব এক অবৈজ্ঞানিক কাজ করে দেখল। মেয়েদের মধ্যে একটা ধারণা-প্রচলিত ছিল যে নিহত মানুষের চোখের মধ্যে খুনীর মুখের ছাপ অবধারিত মুদ্রিত হয়ে যায়। অতএব স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফটোগ্রাফাররা 'রিপার' কর্তৃক নিহতা তিনজন নারীর চোখের ছবি তুলে সে ছবিকে কয়েকগুণ এনলার্জ করে তন্নতন্ন করে খুঁজল খুনীর মুখচ্ছবি। কিন্তু কোন ছাপই পাওয়া গেল না মৃত চোখগুলিতে।

জোড়া খুনের ছয় সপ্তাহ পর, সপ্তম আঘাত এল মেরী জেন কেলি নাম্নী অপর এক রূপোপজীবিনীর ওপর। এই মেয়েটিই একমাত্র পূর্ণ যুবতী ছিল, বয়েস বছর পঁচিশ। এ মেয়েটারও স্বামী ছিল এবং এও অত্যধিক মদ্যপ স্বভাবের জন্য দেহপসারিনী বনে গিয়েছিল।

এর হত্যাকাণ্ড ইনডোরে হয়েছে। দরদস্তুরান্তে এর ভাড়া করা ঘরে গিয়ে জ্যাক একে ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে হত্যা করে। ঘরে গ্যাস

বা মোমবাতি ছিল না। তাই বুঝি ঘাতক কাগজ ও মেয়েটার পোশাকে অগ্নিসংযোগ করে তার আলোয় বীভৎস শল্যকর্ম চালিয়ে কেলিকে খুন করে।

এ ঘটনায় লণ্ডনে ভীষণ হুলুস্থুল পড়ে গেল। চতুর্দিকে লক্ষ কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠল: এ কোন্ বর্বর যুগে বাস করছি আমরা? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বসে বসে করছে কি? এটা কি একটা সুসভ্য নগরী, নাকি আদিম আফ্রিকার গহন অরণ্য? জনসাধারণ সহ চতুর পুলিশ বিভাগও দেখা গেল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহায়।

সময় বয়ে যেতে লাগল। উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায় শঙ্কা শিহরণে ভরা জগদ্দলভারী দুঃসময় কাটতে লাগল। আবার কখন কোথায় আঘাত আসে, কে জানে, চারদিকে এই ধরনের শঙ্কা ত্রাস আতঙ্ক।

কিন্তু আশ্চর্য, বেশ কিছুকাল ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হল না। আরও কিছুকাল গেল নির্বিঘ্নে। এইভাবে কেটে গেল মাস, বছর। বছরের পর বছর। জ্যাক-দি-রিপার যেমন অকস্মাৎ এসে উদয় হয়েছিল, তেমনি সহসাই যেন সে মিলিয়ে গেল। লোকটা কি পালিয়ে গেল? নাকি স্বাভাবিক মৃত্যুতে এ দুনিয়া থেকে সাফ হয়ে গেল চিরতরে? এর কোন সদুত্তর তদানীন্তন সময়ে কেউই এমন কি দক্ষ পুলিশ বিভাগও দিতে পারেন নি।

লণ্ডনবাসীদের ইতিহাসে এটি এক অনুদ্ঘাটিত অপার রহস্য রূপেই রয়ে গেল। শুধু একটা ঘোর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি হয়ে রইল জ্যাক-দি-রিপার নামটি। কুখ্যাত পল্লীর গণিকারা আজও সেই ভয়াবহ কালকে স্মরণ করে নেশার মধ্যেও চমকে চমকে ওঠে।

* * *

তারপর, বহুকাল পর, উক্ত ঘটনাকাল থেকে পুরো ৬৮ বছর বাদে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ঘটল সেই বিস্ময়কর উন্মোচনটি। অকল্পনীয় সে উদ্ঘাটন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ডন উইস্কি, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বহুবার বহু গোপন গুপ্তচরীয় ব্যাপারে ইয়োরোপ চষে

বেড়িয়েছিলেন, তিনি আবাল্য কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিশ্বের রক্তাক্ত এক ক্লাসিক ক্রাইমের রহস্যময় নায়ক সেই 'জ্যাক-দি-রিপারের' রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হলেন।

শার্লক হোমস্ এর মত দক্ষতায়, তদানীন্তন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফাইল ও সংবাদপত্র, লণ্ডন টাইমস্-এর হলদে হয়ে যাওয়া সংবাদাদি ও মন্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ, বিচার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি যে কাহিনীর উদ্ঘাটন করলেন তা যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর। বলতে গেলে অলৌকিক এক ঘটনারই বিস্তৃত বিবরণ সেটি। পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তি প্রয়োগের এক পরমাশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

ডন উইস্কির গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিবরণী প্রকাশ পায়।

পর পর সাত সাতটি গণিকা হত্যাকারী সেই নরপিশাচ একদা গর্বভরে পুলিশ দপ্তরে একটি মেয়ের কর্তিত কিডনী পাঠিয়ে দিয়েছিল। দেয়ালে দেয়ালে চকখড়ি আর নিহত গণিকাদের রক্তের দ্বারা তার অপরাধ কাহিনী দম্ভভরে লিখে রাখত। আরেকবার এক সংবাদপত্র অফিসে লিখে পাঠিয়েছিল : এটি হল আমার চতুর্থ হত্যাকাণ্ড। আমি আরও ষোলটি স্ত্রীলোক বধ করে তবে অবসর নেব। ইতি—জ্যাক-দি-রিপার।

সর্বপ্রথম নিহত এম্মা এলিজাবেথ স্মিথের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ কিন্তু আদৌ ছাপা হয়নি লণ্ডন টাইমস্-এ। দ্বিতীয় মার্থা ট্যারবামের বিষয়ে টাইমস সর্বপ্রথম মুখ খোলে। ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখে, সন্দেহাতীতভাবে এ হত্যাকাণ্ডটি একটি বীভৎস অপরাধ।

গণিকাপল্লীতে সাধারণত মারধোর খুন জখম আকচারই সংঘটিত হয় বলে হয়তো কাগজে প্রথমটা একে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু তৃতীয়া মেরি অ্যান নিকোলস্-এর হত্যার পরই সবার টনক নড়ল। সংবাদপত্রেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। সারা শহর ভয়ে আতঙ্কে

শিহরিত হয়ে উঠল। এই রকম যখন বিপর্যস্ত অবস্থা ঠিক সে সময় ঘটনামঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সেই মানুষটি। যাঁর অবিশ্বাস্য কার্যকলাপ দেখে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ বিভাগও তাজ্জব হয়ে গেল।

সেই মানুষটির নাম রবার্ট জেম্‌স লীস। তিনি ছিলেন সর্বজনবিদিত দিব্যদর্শী অলৌকিক শক্তিধর এক ব্যক্তি। যীশুখ্রীস্টের মানবতা বোধে বিশ্বাসী, এই ধার্মিক-প্রবর ছিলেন উচ্চশ্রেণীর একজন মানবপ্রেমিক। এই ভদ্রলোকের আদর্শনিষ্ঠাতেও কারুর যদিও কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না তবু কিছু লোক তার দৈবশক্তিতে আস্থা রাখতে পারেনি। সে যাই হোক, রবার্ট জেমস লীস-এর ব্যক্তিগত যাবতীয় অর্থাদি হোয়াইট চ্যাপেল অঞ্চলে দুঃস্থ দরিদ্র নিপীড়িত বাসিন্দাদের হিতার্থে ব্যয়িত হত। তাদের হিতে লীস-এর জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত।

এ হেন লীস-এর একদা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন হল।

রাত্রিকালে স্বপ্ন মধ্যে লীস দেখলেন তাঁর 'আত্মিক শক্তি' তাকে বলছে, ওরে শুনে রাখ, একটি পুলিশ স্টেশনের সন্নিকটে পরবর্তী নারী হত্যাটি করবে ঐ জ্যাক-দি-রিপার! আর অপরাধী সন্ধানে এবং তাকে গ্রেপ্তার করবার ব্যাপারে তুই-ই হবি প্রধান হোতা।

রাত্রিশেষে সকালবেলা লীস সবিস্ময়ে দেখলেন যে স্বপ্নের ঘটনাটা হুবহু তাঁর নিজ হাতের লেখায় লিখিত হয়ে বিছানার পাশে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। তিনি জ্ঞাতসারে ঐ রকম লিখেছেন বলে কিছুতেই স্মরণ করতে পারলেন না। তবে এই ধরনের অজ্ঞাতসারে স্বতঃলিখনের দৃষ্টান্তে তিনি ইতিপূর্বেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলে এ ব্যাপারে তেমন বিস্মিত হলেন না।

তাঁর এই স্বপ্নে দেখা ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ এক পত্রে এই বিবরণ জানিয়ে দিলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে। কিন্তু সে সময় হাজার হাজার সব উদ্ভট পত্র পুলিশ দপ্তরে বন্যার মত আসতে থাকায় তারা ঐ পত্রের কোনরূপ প্রাপ্তি স্বীকারই করল না।

চতুর্থা নারী অ্যানি চ্যাপমান খুন হল ৮ই সেপ্টেম্বর, স্থান: হানবারি স্ট্রীট। এবার প্রমাণিত হল খুনীর হাতিয়ার ছিল তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার সরু ব্লেডের ছয় থেকে আট ইঞ্চি দীর্ঘ এক ছুরিকা। আঘাত ও কাটাকাটির ধরন-ধারণ দেখে স্পষ্টতঃই মনে হল শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে খুনীটির অগাধ জ্ঞান বর্তমান।

এই খুনটি কিন্তু হুবহু লীস-এর স্বপ্নদর্শন মত স্থানের অতি কাছাকাছি সংঘটিত হল। এবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে দুজন পুলিশ ইন্সপেক্টর সারাসরি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করল। একজন যদিও কাকতালীয় ঘটনা বলে লীসও-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিল, কিন্তু অপর অফিসার মূলত ধর্মভীরু মানুষ হওয়ায় লীস-এর কথাবার্তা খুবই মনোযোগ সহকারে শুনে গেল। লীস-এর কথা, তাঁর স্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

কোনদিকেই যখন কোন প্রকাব সূত্র সন্ধান হচ্ছে না, তখন 'নাই মামার চেয়ে কানা মামাও শ্রেয়' এই প্রবাদবাক্য অনুসরণে পুলিশ ইন্সপেক্টরটি লীসকে অনুরোধ জানিয়ে গেল, তিনি যেন সর্বদা তার পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক সূত্রগুলি নিয়মিত ভাবে পুলিশের গোচরে আনেন।

অনুরোধ তিনি রাখলেন কয়েক দিনের মধ্যেই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এক পত্র লিখে জানালেন যে একদা যখন তিনি বৈঠকখানায় বসে ছিলেন, সে সময় সহসা তাঁর নজরে পড়ল দুজন মানুষ। একজন নারী অপরজন পুরুষ। বড় রাস্তা দিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল। লীস তাঁর মনশ্চক্ষে তাদের অনুসরণ করতে থাকলেন। দেখলেন, সেই দুজন নরনারী একটি সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল......তার পাশেই আলো ঝলমল একটা পানশালা অবস্থিত......দেখলেন, মেয়ে ও পুরুষটা এবার অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা কোণে চলে গেল......মেয়েটাকে মনে হল আধা মাতাল, তবে পুরুষটি পরিপূর্ণ স্বাভাবিক। লোকটির পরনে ছিল স্কচ্ টুইডের গাঢ় স্যুট, বাহুতে তার হাল্কা ওভারকোট ঝুলছিল, মাথায় ছিল হাল্কা হ্যাট। তার নীলাভ চোখ দুটি থেকে যেন

পাশব রশ্মি ঠিকরে পড়াছল।

লোকটা এরপর তার হাল্কা ওভারকোটটাকে আস্তে করে মাটিতে পেতে দিয়ে তার ওপর হাতের ছড়িটা রেখে দিল। অতঃপর আচমকা মেয়েটারমুখ একহাতে চেপে কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা দীর্ঘ ছুরি বের করে মুহূর্তে স্ত্রীলোকটির গলা কেটে ফেলল। যতক্ষণ পর্যন্ত না মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল ততক্ষণ সে তার মুখ চেপে ধরে রইল।

এবার লোকটা পর পর অনেকবার ছুরিকাঘাত করল স্ত্রীলোকটার দেহে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে লোকটার শার্টের সম্মুখ ভাগ ভিজিয়ে দিল...প্রতিটিআঘাত করল সে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক নিপুণতায়। এরপর মেয়েটার পোশাকের অংশবিশেষ ছিঁড়ে নিয়ে রক্তমাখা ছুরিটা মুছে নিল। অবশেষে সেটা ভেতর পকেটে ঢুকিয়ে শার্টের রক্তের দাগ ঢাকতে কোটের বোতামগুলো এঁটে দিল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব নিয়ে সে ধীর স্থির শান্ত পদক্ষেপে অকুস্থল ত্যাগ করে গেল।

আর আশ্চর্য, পঞ্চম হত্যাকাণ্ডটি হল হুবহু লীস-এর লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী। 'লং লিজ' নাম্নী মেয়েটিকে সত্যি সত্যিই রিপার সেই সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে ঢুকে হত্যা করে। লীস-এর বর্ণনায় যেটি ছিল ঝলমলে পানশালা,আসলে সেটি হল আলো ঝলমল সোসালিস্ট ক্লাবের মিটিং-এর হলঘর।

এ ব্যাপারে পুলিশ যেমন পরম বিস্মিত হল, তেমন স্বয়ং লীসও বিচলিত হল ততোধিক। বিহ্বলভাবে সে জানালো, আমি ক'টা দিন কন্টিনেন্টে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চাই। নয়তো আমি পাগল হয়ে যাব।

যদিও ইতিমধ্যে পুলিশের খাতায় লীসও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল, তবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য ছুটি দিল। বিশ্রামান্তে ফিরে আসবার পর লীসকে সন্দেহের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হল। কেননা ইতিমধ্যে জ্যাক-দি-রিপার পুনরায় আরেক আঘাত হেনে বসেছে।

ষষ্ঠ নারী ক্যাথারিন এডাওজ-এর গলা কাটা ক্ষতবিক্ষত মুখাবয়ব ও দেহের নিম্নাঙ্গে অবর্ণনীয় আঘাতপ্রাপ্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে মিটার স্কোয়ার নামক স্থানে।

পুলিশ বিভাগ ও সংবাদপত্র অফিসে জ্যাক-দি-রিপার-এর স্বাক্ষরিত বেশ কয়েকটি চিঠি এসে পৌঁছল। সে সব চিঠির ভাষা ও ভঙ্গী দেখে মনে হল অজ্ঞাত খুনীটি একটি অকল্পনীয় জানোয়ার বিশেষ।

একটি কার্ড ও চিঠি সে পাঠিয়েছিল সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সীতে। সে পত্র তারা পুলিশের হাতে অর্পণ করে। পত্রে সে তার অপরাধ স্বীকার করে। পরে সে লিখেছে পরবর্তী কার্যের দ্বারা সে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে ভবিষ্যতে নিহতা নারীটির কান কেটে নিয়ে তা নিউজ এজেন্সীতে আনন্দের প্রীতি উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে। পত্রে একটি অনুরোধও সে জানিয়েছে: আরও কয়েকটি কার্য সমাধা না হওয়া পর্যন্ত এজেন্সী যেন অনুগ্রহ করে তার পত্রটি প্রকাশিত না করে।

চারদিন বাদে ফের জ্যাক-দি-রিপার স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত পত্রটি পাওয়া গেল: ডিয়ার বস্ আমি মোটেই চাল মারছি না। কাল আপনি এই শর্মার কাজের একটি সংবাদ পাবেন। এবার ডবল অনুষ্ঠানের। প্রথম মেয়েটা কিছু চিঁচি চিৎকার করেছিল, তাই সরাসরি তাকে খতম করতে পারিনি। যাই হোক তা সত্ত্বেও সে আমার হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই ঝামেলার জন্যে তার কান কেটে পুলিশের কাছে পাঠাবার সময় পাইনি। চিঠিটা আমার অনুরোধমত চেপে রাখবার জন্যে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।—জ্যাক-দি-রিপার। এই পত্রে তারিখ ছিল ১লা অক্টোবর।

দু'সপ্তাহ বাদের ঘটনা। হোয়াইট চ্যাপেল ভিজিলেন্স কমিটি এই কেস-এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট সদস্য মিঃ লাস্ক ছোট একটি কার্ডবোর্ড বাক্স সহ একটি চিঠি পেল রিপারের কাছ থেকে।

পত্রে লেখা ছিল: নরক থেকে বলছি। হে মিঃ লাস্ক! স্যার,

স্ত্রীলোকটির দেহ থেকে কেটে নেওয়া কিডনীর অর্ধেকটা পাঠালাম। এ বস্তুটি আপনার জন্যই রেখেছিলাম।...যদি কিছুদিন আরও অপেক্ষা করেন তো যার দ্বারা এটাকে কেটেছি সেই রক্তাক্ত ছুরিটাও পাঠাতে পারি উপহার স্বরূপ। ক্ষমতা থাকলে আমায় ধরবার চেষ্টা করে দেখবেন মাননীয় মিঃ লাস্ক। দেখব কত বাহাদুর আপনি।

ভীত ও উত্তেজিত লাস্ক সেই কুৎসিত মাংসখণ্ডটিকে একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তারে পরীক্ষা করে জানায় ওটা লম্বালম্বি ফালি দেওয়া ৪০।৪৫ বছর বয়স্কা কোন নারীর কিডনী। নারীটি প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করত। তার দেহ থেকে হপ্তা তিনেক পূর্বে এটাকে কেটে নেওয়া হয়েছে।

এই বিবরণ মিলে যায়এভাওজ নাম্নী-গণিকাটির হত্যার ব্যাপারে। বেচারীর বাঁদিকের কিডনী সত্যি সত্যিই অপহৃত হয়েছিল।

এরপর একদা সেই দিব্যদর্শী লীস যখন তার বন্ধু শ' এবং বেক-এর সঙ্গে বসে নৈশাহার করছিলেন, সহসা তিনি নিদারুণ এক পেশীর আক্ষেপজনিত বেদনায় পেট চেপে ধরে নুয়ে পড়েন। বন্ধুরা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যায়। লীস তখন তার বেদনা বিকৃত মুখ তুলে তাদের বলে ওঠে, জ্যাক-দি-রিপার? সে আবার খুন করছে—উঃ কি ভীষণ! এই মুহূর্তে সে আরেকটি খুন করে ফেললে।

বন্ধু শ নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত তখন ৭-৪৯ মিনিট।

খাওয়া মাথায় উঠল, পরমুহূর্তে ছুটে তিনজন গেল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসে। তারা সেখানে এই ঘটনার বর্ণনা সবে শুরু করেছে এমন সময় খবর এল যে একজন কনস্টেবল ৭-৫০ মিনিটের সময় মিলার্স কোর্ট-এ মেরী জেন কেলি নামক একটি ভ্রষ্টা মেয়ের নগ্ন মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে।

এ দুঃসংবাদ শোনবার পর লীস ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় পুলিশের সঙ্গে সোজা ঘটনাস্থলে চলে যায়। সেই অন্ধকার জায়গায় পৌঁছনো মাত্র লীস বলে ওঠে, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

একটা আলো ফেলা হল অন্ধকার দেওয়ালে। দেখা গেল সেখানে চকখড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে : সতেরো। জ্যাক-দি-রিপার।

সতেরো! তবে কি সাতের বদলে সতেরোটি খুন করেছে শয়তানটা!

সেই মুহূর্ত থেকে লীস সর্বক্ষণের জন্য খুনী সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করল। তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল যে করেই হোক এই রহস্যজনক হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা। খুঁজে তাকে বের করতেই হবে।

একদিন লীস সস্ত্রীক বাস-এ চেপে কোথায় যেন যাচ্ছিল। নটিং হিল-এ হাতে হাল্কা ওভারকোট নিয়ে স্কট টুইড স্যুট পরা এক ব্যক্তি বাস-এ উঠল। সহসা লীসের মনের মধ্যে ঠাণ্ডা স্রোতের এক ভাবাবেগ বয়ে গেল।

চমকে উঠে লীস তার স্ত্রীর বাহুতে মৃদু খোঁচা দিয়ে বলে উঠল ফিসফিসিয়ে—শুনছ, এই—এই হল সেই জ্যাক-দি-রিপার!

স্ত্রী অবিশ্বাসের সুরে বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল, বোকার মত কথা বল না তো!

যাকে দেখছ তাকেই ভাবছ জ্যাক-দি-রিপার, ছিঃ।

বিশ্বাস কর ডারলিং, এই সেই নারীঘাতক রিপার!

চুপ কর।

অগত্যা চুপ করে গেল লীস।

মার্বেল আর্ট স্টপ-এ সেই লোকটা বাস থেকে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লীস স্ত্রীকে ফেলেই বাস থেকে নেমে গিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। পথে দাঁড়ানো একজন পুলিশকে লীস লোকটিকে গ্রেফতার করতে বললেন।

পুলিশটি ওর কথা প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিল।

ততক্ষণে লীস দেখল সেই সন্দিগ্ধ লোকটা ভাড়া গাড়ি ডেকে তাতে উঠে পিকাডিলির পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লীস-এর এ ঘটনার রিপোর্টে পুলিশ কৌতূহলাক্রান্ত হল সন্দেহ

নেই। তবে এ ব্যাপারে এমন কিছু লাভ হল না তাদের, কারণ জ্যাক-দি-রিপারের দেহ বর্ণনার হাজারো রিপোর্ট আগেই ছিল। এবং মজার কথা তার কোনটির সঙ্গেই কোনটির মিল নেই।

এই পঁচিশ বছরের যুবতী মেরী জেন কেলির হত্যাকাণ্ড হল বাস্তবিকই লোমহর্ষক ও ভয়ংকর। বোঝা গেল 'রিপার' তার বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পথে ক্রমশই উন্মত্ত ও হিংস্রতম হয়ে চূড়ান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার রক্তলোলুপতা সীমাহীন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কেননা প্রতিটি নতুন হত্যাকাণ্ডই ক্রমবর্ধমান নৃশংসতায় আবিল হয়ে উঠেছে।

আরও বেশী হত্যাকাণ্ডের আশঙ্কায়, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত দিব্যদর্শী লীসকেই আঁকড়ে ধরল, তারই শরণ নিল! মানবিক শক্তি যখন বিফল হচ্ছে তখন দৈবশক্তিতে আস্থা ছাড়া গত্যন্তর কি। স্থির হল একজন ইন্সপেক্টর ও বেশ কিছু পুলিশ এখন থেকে লীস নির্দেশিত পথে অপরাধী সন্ধানে ব্যাপৃত হবে।

আরম্ভ হল এক আজব পদযাত্রা, বিচিত্র পথ পরিক্রমা। এমন ঘটনার নজীর শুধু লণ্ডন কেন বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর পাওয়া যায়নি এতাবৎকাল।

লীস ধ্রুব নিশ্চিত ছিল যে তাঁর তথাকথিত 'মনস্তাত্ত্বিক শক্তি' উক্ত স্যাডিস্টিক নারীঘাতকের লুক্কায়িত অজ্ঞাত বাসস্থান সন্ধানে তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবে।

একদিন সকালবেলা থেকে সেই পুলিশ-বাহিনী লীস্-এর নেতৃত্বে তাঁরই পিছনে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দিব্যদর্শী লীস পথ পরিক্রমা করতে করতে, তাঁর অলৌকিক শক্তির নেতৃত্ব পালনের প্রচেষ্টায় একবার ডাইনে একবার বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পথ চলছিলেন।

অনুচররা কিছুটা হতাশ ভাবে বাধ্য হয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছিল। এ যেন নিঃসীম এক পদযাত্রা, অপরাধী সন্ধানের তীর্থযাত্রা। রাস্তার মানুষজন এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ভিড় করে দেখতে

লাগল এই পথচলা।

রাত তখন চারটে। অকস্মাৎ লীস এসে থেমে পড়লেন ওয়েস্ট এণ্ড ম্যানসন নামক এক অট্টালিকার গেট-এর সামনে। আবছা আলো আসা একটি জানলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শুকনো কণ্ঠে বলে উঠলেন লীস, ঐখানে আপনাদের প্রার্থিত ব্যক্তিটি রয়েছে। ঢুকে যান, গ্রেপ্তার করুন তাকে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর এবার সত্যি সত্যিই ভড়কে গেল। কি বলছেন আপনি। এ বাড়ির মালিক কে জানেন? তিনি হলেন শল্য-চিকিৎসার প্রখ্যাত এক সার্জেন। শুধু তাই না, শোনা যায় ইনি ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রেও আবদ্ধ। আপনি এ কি বলছেন?

ঠিকই বলছি অফিসার, দিব্যদর্শী আচ্ছন্নের মত বলে যান।

তবু আরও নিশ্চিত হবার জন্য ইন্সপেক্টর এবার লীসকে বলে, ঠিক আছে। আপনি আগে বাড়ির ভেতরকার হলঘরের বর্ণনা দিন তো দেখি?

আচ্ছন্নের ঘোরে তদ্গত ভাবে লীস বলে গেলেন, বেশ, তাই বলছি! ডানদিকে আছে কালো ওক কাঠের পিঠের দিকটা উঁচু একটি পোর্টার্স চেয়ার। ঘষা কাঁচের জানলার ধারে রয়েছে সেটা। এবং তার তলায় শুয়ে আছে একটা বিশালকায় ম্যাসটিফ কুকুর।

পুলিশদল বাড়ির ভৃত্যকে জাগিয়ে ভেতরের হলঘরে প্রবেশ করল। সত্যি সত্যিই তাই, হুবহু লীস এর বর্ণনা মত সব মিলে গেল। একমাত্র ব্যতিক্রম কুকুরটা নেই সেখানে। পরে অবশ্য ভৃত্য স্বীকার করল যে সে সবে কুকুরটাকে চেয়ারের তলা থেকে বের করে নিয়ে বাগানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ড্রয়িংরুমে বসে ইন্সপেক্টর ডাক্তারের পত্নীর সঙ্গে কথা বললেন। প্রশ্নের জবাবে ভদ্রমহিলা জানালেন, হ্যাঁ, তাঁর স্বামী কথাকথিত জ্যাক-দি-রিপারের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডকালীন বাড়িতে ছিলেন না। স্বামী নাকি প্রায়শঃই তাঁকে ভয় দেখাতেন নানা ব্যাপারে। ভদ্রমহিলা

এও বললেন যে, ক্রমে ক্রমে আমার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে আমার স্বামী আদৌ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নন।

দীর্ঘকায় নীলনয়ন, কঠোর চরিত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রখ্যাত ডাক্তার। তাঁর প্রথম নাম হল জন। তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রশ্নাদি করা হল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি ইন্‌স্‌পেক্টরকে জানালেন যে প্রায়ই নাকি তিনি নিজেকে হসপিটাল ও চেম্বার থেকে বহুদূরে কোন এক অচেনা স্থানে আবিষ্কার করতেন। কি ভাবে কোথায় কখন গেলেন এলেন তা শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারতেন না। দু'বার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবার পর তিনি দেখেছেন যে তিনি সশরীরে নিজের ঘরের মধ্যেই বসে রয়েছেন। যেন এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিলেন, চৈতন্যোদয় হতে দেখেছেন তাঁর শার্টের সামনেটা লাল রক্তে ছোপানো, আর সারা মুখ তাঁর আঁচড়ানো খিমচানো। বিস্মৃতির অন্তরালেই এসব ঘটনা ঘটে গেছে বলে জানান তিনি।

বাড়ি সার্চ করা হল। তাতে পাওয়া গেল, স্কচ-টুইডের স্যুট, হালকা নরম ফেল্ট হ্যাট এবং একটা হালকা ওভারকোট—সব মিলে যাচ্ছে। এরপর আরও কিছু জেরার পর অবশেষে ডাক্তার তার কৃত অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসারকে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সহসা বলে ওঠেন, আমাকে এখুনি হত্যা করে ফেলুন। আমি নিজের মধ্যে একটা দানব নিয়ে এভাবে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব না।

দিব্যদর্শী লীস এক অপার্থিব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল ডাক্তার আসামীর দিকে।

ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হল তক্ষুনি। নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ স্টেশনে। সেখানে তাঁর অতীতের রেকর্ডপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখা হল। তাতে প্রকাশ পেল তিনি যখন গাইজ হাসপাতালে একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট, তখনই দেখা গেছে তাঁর সর্বাধিক পছন্দের সাবজেক্ট ছিল জীবিত প্রাণী ব্যবচ্ছেদ কর্মটি। মানুষই হোক বা প্রাণীই হোক তাদের ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা তাঁকে অসীম আনন্দ দিত।

বোঝা গেল এ লোকটি শুধু ম্যাসোচিস্টই নয় স্যাডিস্টও বটে।

অ্যালিয়েনিস্ট কমিশনের কাছে সাক্ষী দেবার সময় ডাক্তার পত্নী জানায় যে ডাক্তার স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু একজন চমৎকার পিতা, তাদের একমাত্র সন্তানকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। পিতা হিসেবে ভাল, স্বামী হিসেবেও তুলনাহীন এবং মানুষ হিসেবেও অনবদ্য ...কিন্তু যখন অস্বাভাবিক...তখন তাঁকে আর চেনা যায় না।

তাহলে একদিনের একটা কাহিনী বলি, ডাক্তার-পত্নী বলে যান, এক রাত্রে ওপরে উঠে গিয়ে মনে হল নিচেকার ড্রইংরুমে আমার হাতঘড়িটা ম্যান্টলপীস-এর ওপর ফেলে এসেছি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নিচে। কানে এল একটা বেড়ালের অসম্ভব আর্তচিৎকার। চিৎকারটা আসছে ড্রইংরুমের ভেতর থেকে।

সে শব্দে চমকে তাকালাম, ড্রইংরুমের দরজার ফাঁকে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে আতঙ্কে। দেখলাম আমার স্বামী টেবিল ল্যাম্পের আগুনের ওপর বাড়ির পোষা জ্যান্ত বেড়ালটাকে ধরে রেখে পোড়াচ্ছে। লোম ও মাংস পোড়ার বিশ্রী গন্ধের সঙ্গে বেড়ালটার অসহনীয় অন্তিম চিৎকার ও ছটফটানি—উঃ ভাবা যায় না! নিদারুণ ভয়ে আমি না পারলাম সে ঘরের দিকে যেতে না পারলাম এর কোন প্রতিকার বা প্রতিবাদ করতে। দ্রুত পালিয়ে বাঁচলাম সেখান থেকে।

কমিশনের যাবতীয় সদস্য একবাক্যে একই রায় দিল। ডাক্তারকে ভয়ংকর একজন বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ বলে সিদ্ধান্ত করে তাকে একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে ১২৪নং বেড চিহ্নিত হল তাঁর জন্য। গুজবে প্রকাশ একটি খালি কফিন নাকি সেই ডাক্তারের নামে লণ্ডন সিমেট্রিতে তাদের পারিবারিক ভল্টে রক্ষিত ছিল...

ডন উইন্কির উপরোক্ত এই থিয়োরী সমূহ সংগৃহীত হয় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের লণ্ডন টাইমস এবং দিব্যদর্শী লীস-এর মৃত্যু বৎসর ১৯৩১ এর ডেইলী-এক্সপ্রেস পত্রিকা থেকে। ডন উইন্কি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের

পুলিশ-রিপোর্ট এবং অজস্র কনফিডেন্সিয়াল ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে গবেষণারত ছাত্রদের মত এসব তথ্য সংগ্রহ করে। সেই অকল্পনীয় ত্রাস-এর কাল থেকে সুদীর্ঘ ৬৮ বছর পর সংগৃহীত এই সব তথ্যের সত্যতা যাচাই করা অবশ্য প্রকৃতপক্ষেই দুরূহ কর্ম।

ভয়ংকর খুনী জ্যাক-দি-রিপারের ঐসব গণিকাদের প্রতি কিসের আক্রোশ ছিল? উইস্কির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'জ্যাক' বোধ করি কোন এক সময় গণিকাগমনের ফলে মারাত্মক সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়। সে যুগে ঐ কালব্যাধি থেকে নিরাময়ের কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বুঝি এই নিদারুণ প্রতিশোধ ইচ্ছা। তবে এ কথা ঠিক যে জ্যাক-দি-রিপার কি কখনো কোন অবস্থায়ই কোন ভদ্র নারীর গায়ে হাত তোলেনি।

ডন উইস্কির গবেষণায় আরেকটি সংবাদ জানা যায়।

জ্যাক-দি-রিপারকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরবার বা গ্রেপ্তারে সাহায্য করবার জন্য সরকার পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

ইতিপূর্বের ইতিহাসে এমন কোন খবর প্রকাশ পায়নি যে ঐ পুরস্কারের টাকা কাউকে দেওয়া হয়েছিল বা কেউ দাবি করেছিল সে সময়।

অতঃপর দিব্যদর্শী লীস-এর মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় যে তাকে নাকি একাধিকবার মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমীপে তাঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হতে দেখা গেছে। এবং এ গুজবও প্রচলিত ছিল যে লীসকে রাজকীয় প্রিভি পার্স পেনসন হিসেবে বাৎসরিক প্রায় ৮০০ পাউণ্ড করে দেওয়া হয়েছিল বহু বৎসর ধরে।

এইভাবেই ইতিহাসের নিকৃষ্টতম খুনী রহস্যময় জ্যাক-দি-রিপারের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। মজা এই যে এক্ষেত্রে অপরাধী সন্ধানে ও অপরাধী গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ডিটেকটিভের কাজ সমাধা হল এক অলৌকিক উপায়ে জনৈক দিব্যদর্শী মানুষের সাহায্যে।

বিজ্ঞান এখানে হার মানল দৈবশক্তির কাছে।

দানব, মেয়ে ও কুমীর

সে এক ভয়ংকর দানব। লোকটা নররূপে বিচরণ করতো জার্মানীতে; তার অকল্পনীয় কার্যাবলী শুনলে ভয়-বিস্ময়-আতঙ্ক-ক্রোধ প্রভৃতি যাবতীয় অভিব্যক্তি যুগপৎ এসে হানা দেয় মনে। ঘৃণায় রিরি করে অন্তর।

এই বিপুলাকৃতি মানবরূপী দানবটির নাম ছিল উইলহেলম ফাগুট্। জার্মানীর অন্তর্গত মিউনিখ ও প্যাসিং শহরদ্বয়ের মাঝামাঝি এক পথের ধারে এই লোকটার ছিল একটা পানশালা। যুদ্ধকালীন বোমার দ্বারা অর্ধবিধ্বস্ত দুটি একতলা ছোট বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছিল ফাগুটের এই 'বার'।

কাহিনী শুরু করা যাক আঠাশ বছরের দুরন্ত স্বাস্থ্যবতী যুবতী এলিজ-কে দিয়েই। সবে সে এসে পৌঁছেছে ওয়েট্রেস্‌এর চাকরি নিয়ে এই বার-এ। হাতে তার সুটকেস, পাশে দাঁড়ানো নতুন মনিব বিশালদেহী ফাগুট।

—ওমা! কী জঘন্য জীব রে বাবা! ভয় ও ঘৃণামিশ্রিত আতঙ্কে ছানাবড়া চোখ দিয়ে যুবতী এলিজ পাশের ডোবার পানে তাকিয়ে বলে ওঠে।

বিশালদেহী দানব হেসে উঠে বলে, কি বললে মিস? জঘন্য? আমার পোষা এরা জঘন্য জীব? জানো, আমি বিশেষ ভাবে জাহাজে বুক করে এদের আমেরিকা থেকে আনিয়েছি। প্রথম যখন আসে তখন ছিল একেবারে বাচ্চা। এখন এরা ক্রমে ক্রমে বিরাট আকারের হয়ে উঠেছে।

লাগোয়া নীচের দিকের সিমেন্টবাঁধানো ডোবাতে কুৎসিত আকৃতির বিশাল একটা কুমীর বিরাট হাঁ করে যেন হাই তুললো, তারপর পেছনের ক্ষুদ্রাকৃতি দুটি পায়ে ভর দিয়ে অগভীর জলের উপর মুখটাকে উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠলো। এলিজের সারা শরীর কেঁপে

উঠলো, শিউরে উঠলো ভয়ে। সে ত্রস্তে দুপা পিছিয়ে গেল।

দানবাকৃতি পাশে দাঁড়ানো মানুষটি যেন চরম মজা পেল এ ব্যাপারে, এমনি ভাবে হেসে উঠলো, কি গো মিস, ভয় পেলে নাকি? বলে থাবাসদৃশ হাত দিয়ে যুবতীর নিতম্বে একটি বেশ জোরে রসিকতার থাপ্পড় মারলো।

—উঃ কি হচ্ছে স্যার। যুবতী সত্যি সত্যি ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। কিন্তু খুব বেশী রেগে উঠতে পারে না। যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে দুমুঠো অন্ন জোটানোই একদা দায় হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ মানুষের, তথা এই ধরনের মেয়েদের। তাই তারা পুরুষ মানুষদের কোন আচরণেই আর ক্ষুব্ধ হত না, বা মনে কিছু করত না। যা খুশী কর, আপত্তি নেই, শুধু খেতে পরতে দিও। এই ছিল এই সব মেয়েদের মনোগত আদর্শ। সাংঘাতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ভয়াবহ বেকারী বিরাজ করছিল ওদেশে তখন। ফলে নৈতিক মান নেমে গিয়েছিল চরম সীমায়।

অতএব এলিজ যে এই চাকরি নিয়ে এসেছে তার রয়েছে দুটি পর্যায়। প্রথম হল রাত্রে সে ফাগুটের হাউস অফ ফান্-এ ওয়েট্রেস-এর কাজ করবে আর দ্বিতীয়তঃ বাদবাকি সময় সে হবে এই দানবের খেয়ালখুশীর শিকার।

ফাগুটের দৈত্যের মত চেহারা। মুখটি যেন রাক্ষসের মত বীভৎস। গত যুদ্ধে রাশিয়ার একটা গোলার টুকরো লেগে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তা'ক দ্রুতগতিতে করা প্লাস্টিক সার্জারী যেন ওর মুখটাকে আরও বেশী কুৎসিত করে দিয়েছে। মুখের পানে তাকালে মনে হয় লোকটা একটা জ্যান্ত শয়তান।

—দাঁড়াও একটা মজার জিনিস দেখাই তোমায় মিস্, বলে ফাগুট বাড়ির পেছনে গিয়ে একটা ছোট্ট নাদুসনুদুস কুকুরছানা নিয়ে এল। ওর হাতের চাপে ছানাটা কুঁই কুঁই করে উঠছে।

সিমেণ্ট বাঁধানো ডোবায় পাড় থেকে নেমে গেছে একটা 'স্লিপ' এ কেবেঁকে (ঠিক যেমন "স্লিপ" থাকে ছোট বাচ্চাদের পার্কে)।

ফাগুট তারপর সেই কুকুরছানাটাকে স্লিপে গড়িয়ে দিল। ছানাটা চেঁচাতে চেঁচাতে স্লিপের কাঠের ধারগুলো ধরবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে পিছলে গিয়ে পড়ল ডোবার জলে। অন্তিম আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কুমীর ছুটে এসে মুহূর্তমধ্যে কুকুরছানাটাকে প্রকাণ্ড হাঁ-এর মধ্যে নিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। কিছুটা জল তোলপাড়, রক্তমাখানো লাল জল, কুকুরছানার লেজটা বারেক বাইরে দেখা দিয়ে ডোবার জলে তলিয়ে গেল চিরতরে।

এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে ভয়ে ক্রোধে প্রায় চিৎকার করে উঠলো এলিজ। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি মানুষ না জানোয়ার!

দানব ক্ষুব্ধ হল সন্দেহ নেই কথাটা শুনে। বললে, মিস্, তুমি তো জানো না মিউনিখ থেকে পর্যন্ত কত লোক এখানে আসে এই মজা দেখতে।

তারপর থাবার মত হাত দিয়ে মেয়েটার পেলব বাহু সজোরে ধরে বললে, চলো মিস্—এবার কোন্ ঘরে তুমি শোবে তা দেখিয়ে দিই।

বার-এর নাম ফাগুটের 'প্লেস অফ ফার্ন'। মদ খেতে প্রচুর খদ্দেরই আসে। ছয় সাতজন মেয়ে ওয়েট্রেস কাজ করে। বিয়ার বা মদ বিতরণের চেয়ে খদ্দেরদের অপরাপর মনোরঞ্জনই বেশী করে যেতে হয় যুবতী মেয়েগুলির। এখানকার খদ্দেররা অধিকাংশই দিনে কাজকরা মিউনিখের শ্রমিক। তারা একটু মোটা দাগের সুরা ও নারী নিয়ে ফুর্তিস্ফূর্তাই পছন্দ করে বেশী। শহর বন্দরের নাইট ক্লাব তাদের তেমন পছন্দের নয়। অতএব ফাগুটের এই পানশালার ব্যবসায়ে বেশ বোলবোলাও অবস্থা। মদের চেয়ে নারীর আকর্ষণই বেশী ছিল এই সব গাঁইয়া খদ্দেরদের।

ফাগুট কিন্তু শুধুমাত্র নারীর আকর্ষণের প্রতিই নির্ভর করত না। পানশালার এক কোণে ডাইস টেবিল (জুয়া) ছিল। অপর কোণে ছিল একটি পিয়ানো আর মোটা কর্কশ গলায় খদ্দেরদের মনোরঞ্জন-কারী অশ্লীল সব গানের জনৈক গায়ক।

এর উপর ছিল তার পোষা ঐ কুমীরগুলি।

সর্বসাকুল্যে ছয়টি কুমীর ছিল ঐ সিমেন্টবাঁধানো ডোবাতে। তাদের চোয়াল, হাঁ ও ভয়াবহ দাঁত এমন ভীষণ যে তা অনায়াসে যে কোন মানুষকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে খেয়ে ফেলতে পারে।

সন্ধে ও রাত্রির আসরে ফাগুট মাঝে মাঝে পেছনের উঠোনে টাঙ্গানো একটা দমকলী ঘণ্টা বাজিয়ে দিত। সে শব্দ শুনে উৎসাহী কিছু মাতাল খদ্দের গিয়ে উপস্থিত হত ডোবার সামনে। ফাগুট কখনো কুকুর কখনো কুকুরছানা সেই 'স্লিং' মারফত কুমীরদের মুখে ফেলে দিয়ে খাওয়ানোপর্ব সম্পন্ন করতো। মদের নেশায় রঙিন চোখ ও মন নিয়ে খদ্দেররা এসব দেখে যারপরনাই মজা পেত। বিভিন্ন খাদ্য দেওয়া হত কুমীরদের; সবই জীবন্ত। কখনো কুকুর, কখনো এক বাক্স বেড়ালছানা। একবার ফাগুট এক স্পেশাল 'শো' করেছিল বুড়ো ও রুগ্ন একটা ঘোড়া এনে। সেটাকে চোখ বেঁধে চাবুক মেরে ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

সে রাতে কুমীরগুলোর ঐ বিশাল ঘোড়াটাকে খেতে পুরো ছয় মিনিট সময় লেগেছিল। ডোবাটার জল রক্তে রঙিন হয়ে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য।

বাড়ির পেছন দিকে এই সব খাদ্যসামগ্রীরূপ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত জীবজন্তুর একটি খাঁচার মত ঘর ছিল। আর তারই কাছে ছিল ফাগুটের নিজের শোবার কেবিন। এবং এর লাগোয়া একটা বড় হলঘরে থাকতো তার এই সব তরুণী যুবতী ওয়েট্রেসরা।

এইখানে এলিজকে ঘর দেখাতে নিয়ে গেল ফাগুটের উপযুক্ত এক সহকারী বুড়ো শয়তান। ষাট বছর বয়সের পিঠে কুঁজওয়ালা এই বৃদ্ধটির নাম অ্যালবার্ট গেস্লার। সারা মুখে তার দাড়িগোঁফ। তাতে সকালে খাওয়া খাবারের কিছু কিছু অংশ সর্বদাই লেগে থাকত। কুতকুতে চোখ চেয়ে একসময় বুড়ো গেস্লার একটা দরজার প্রতি কুৎসিত আঙুল দেখিয়ে বললে, এই যে দেখছো, এটা হল ফাগুটের

কেবিন। এঘরে তোমাদের অনেক বারই যাতাযাত করতে হবে, বলে বিদ্‌কুটে শব্দে নাক ঝেড়ে অশ্লীল অশোভন এক ভঙ্গী করে বললে, ফাগুট একজন পুরুষের মত পুরুষ, হুঁ হুঁ বাবা। ওর চাহিদা বড় জবর, দু তিন চারটে মেয়ে ওর কাছে এক টিপ নাস্যির মত।

—অ্যাঁ, এলিজের বিস্মিত মুখ থেকে এ শব্দটা বেরিয়ে এল। মেয়েটির বুঝতে বাকি রইল না যে এ তো ওয়েট্রেসের চাকরিমাত্র নয়, সে এসে প্রবেশ করলো প্রকৃতপক্ষে ফাগুটের হারেমে।

—ওর এখানে কি অনেক মেয়ে রয়েছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত বহুত, অশালীন চোখ নাচিয়ে কদর্য কুঁজো বৃদ্ধ বললে, এবং প্রত্যেক সময়ই ওর নিত্যনতুন মেয়ে চাই। মেয়েরা এখানে বেশীদিন টেকে না। তারা আসে। এক হপ্তা বা মাসখানেক, ব্যস তারপর তারা চলে যায় কোথায় কে জানে। বুঝলে মিস। ঠিক আছে, সবুর কর। সবুরে মেওয়া ফলবে।

সবুর বিশেষ করতে হল না চাকরির প্রথম রাত্রেই ফাগুটের খপ্পরে পড়তে হল ওকে। ফাগুটের কায়দা-কানুনের মধ্যে কোন ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। সবই সোজা সরল প্রক্রিয়া। রাত তিনটে নাগাদ পানশালার ডিউটি শেষে এলিজ ক্লান্তপদে নিজ ঘরের দিকে ফিরছিল। কখন পেছনে এসেছে ফাগুট, এলিজ টের পায়নি। সহসা তার ডান হাত ধরে মালিক বললে, চলে এস মিস। আজ রাতে আমার ঘরেই শোবে।

কোন বাধা কোন অনিচ্ছা সে গ্রাহ্য করে না করলও না।

এলিজ স্বভাববশতঃই বাধা দিতে গিয়ে বলেছিল, না না—

মিনিটখানেক ক্রূর চোখে চেয়েছিল ফাগুট। মনে হয়েছিল এখুনি বুঝি সে মেয়েটার মুখে এক ঘুষি মারবে। কিন্তু পরিবর্তে উন্মত্ত হাসি হেসে বললে, এ শর্মা কোন বাধা বা অনিচ্ছা বা ন্যাকামি পছন্দ করে না বুঝলি কুত্তি। যখন যা চাই তক্ষুনি সেই মুহূর্তে তা-ই পেতে অভ্যস্ত আমি। চলে আয়।

বলে প্রায় টেনে হিঁচড়ে এলিজকে নিয়ে এক ঝটকায় নিজ

বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এক সপ্তাহ কাটলো। ইতিমধ্যে অপরাপর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এলিজের। মেরী নামে রক্তকেশী এক মেয়ে, বার্লিনের কয়েকটি শান্ত লাজুক মেয়ে, ফ্রান্সেসকা নাম্নী দারুণ স্বাস্থ্যবতী একটি ইতালীয় যুবতী। এই বেকার মেয়েটি অত দূর থেকে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে এসে ফাগুটের খপ্পরে পড়ে যায়।

এদের কেউই খুব বেশী দিন এখানে আসেনি। বড় জোর মাসখানেক হয়েছে তখন।

—পুরনো সব মেয়েরা চলে যায় কেন? এলিজ প্রশ্ন করে।

রক্তকেশী মেরী কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ঠোঁট উলটে বলে, জানি না ভাই। যে কোন সকালে উঠে দেখবে একটি মেয়ে নেই, চলে গেছে। ফাগুট বলে মেয়েটা নাকি পালিয়ে গেছে।

এরপর গলা নামিয়ে নিম্নকণ্ঠে মেরী বলে, এই বদমাইশ দৈত্যটার কোন অশোভন বদ ইচ্ছে পালনে অসম্মতি পালনে প্রচণ্ড প্রহার খেয়ে মেয়েগুলি পরিত্রাণের আশায় হয়ত ফের পালিয়ে চলে যায় মিউনিখ।

এ ধারণা অবশ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে কিছুকাল বাদেই। এবং এলিজের পক্ষে তা মর্মান্তিক ভাবেই।

১৭ই জুন অর্থাৎ এলিজ-এর চাকরির সাত দিনের মধ্যেই দেখা গেল রক্তকেশী মেরীও এক সকালে হাওয়া হয়ে গেছে। এলিজ বেশ হকচকিয়ে গেল। ওর মতে ফাগুটের সাংঘাতিক কোন নির্দেশ অমান্য করা ছাড়া মেরীর মত মেয়ে তো ভয় পেয়ে পালাবার মেয়ে নয়।

কে জানে বাবা। এলিজ চুপ করে গেল। কদিন ধরে ফাগুট আর ওকে তার ঘরে ডাকছে না। চাকরিটিও বেশ ভাল। প্রচুর টিপ্‌স্ আছে। আনন্দেই আছে সে। তাই এমন জীবনকে সে গোঁজিয়ে দিতে চায় না পরের কথা ভেবে।

সকালের ব্রেকফাস্ট কফি আনতে এলিজ যখন সেই কুমীর-ডোবার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন পথের উপর চারকোনা একটি লাল ফ্লানেলের ছোট টুকরোর মতো বস্তু পড়ে থাকতে দেখলো। থেমে নিচু হয়ে

সেটা তুলতে যাবে সহসা পেছন থেকে ফাওস্টের কণ্ঠ ভেসে এল :

—এই ! এলিজ ! চোখ লাল করে ফাওস্ট চিৎকার করে ওঠে, কী, কী তুলছ ওখান থেকে ?

—না না কিছু নয়। মালিকের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ভয় পেয়ে এলিজ বলে ওঠে, বিশেষ কিছু নয়, একটা কাপড়ের টুকরো বোধহয় পড়ে আছে।

অতি দ্রুত পা চালিয়ে এসে ফাওস্ট সেটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, এটা একটা কাপড়ের টুকরোই বটে।

বললো বটে কিন্তু তার আঙুলে ধরা বস্তুটাকে কাপড় বলে আদৌ মনে হল না। মনে হল নরম ও ভিজে কি যেন একটা জিনিস।

—এ ব্যাপাটার কথা ভুলে যাওয়াই হবে তোমার পক্ষে শ্রেয়:, বুঝলে কুত্তি ! কর্কশ কণ্ঠে একথা বলে ফাওস্ট সেই লাল রঙের, নরম ও ভিজে বস্তুটি পকেটে পুরে নিয়ে চলে গেল।

এলিজের যদি কিছু সন্দেহও হয়ে থাকে মনে তবুও সে মুখে কুলুপ এঁটে রইলো।

তিন দিন বাদে মিউনিখ পুলিশ এল ফাওস্টের পানশালায়। ওকে জেরা করে তারা ফিরে গেল। তাদের ডাইরীতে লেখা হল : উইলহেল্ম ফাওস্টকে আমরা জেরা করেছি মেরী নাম্নী একটি মেয়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে তার বাবার নালিশ অনুযায়ী। ফাওস্ট জানায় ১৭ই জুন রাত ২টায় মেরী চলে যায়। মেয়েটি নাকি চলে যাবার কোন কারণ তাকে বলে যায়নি। লোকটা বেয়াদপ ধরনের। কথাবার্তা বলতে সবিশেষ অনিচ্ছুক। মেয়েদের সঙ্গে আচার আচরণে ওর খুবই বদনাম আছে। লোকটার প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন।

পুলিশ এলিজকে জেরা করেনি। সে অবশ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু বলেওনি। কিন্তু সে জানে যে মেরী সেদিন রাত দুটোয় আদৌ চলে যায়নি। কেন না সে স্বচক্ষে দেখেছে রাত তিনটের সময় মেরীর হাত ধরে ফাওস্ট তার শোবার ঘরে ঢুকছে রাত্রিযাপন করতে।

পরদিন যথারীতি ফাওস্ট চলে গেছে মিউনিখে নতুন মেয়ে আনতে। মেরীর বদলী মেয়ে এল এক ১৯ বছর বয়স্কা কাজলকেশী

হলদে ফ্যাকাসে গাত্রবর্ণের ব্যাভেরিয়ান তন্বী যুবতী, হানা স্কোবার। প্রথম রাতই তাকে ফাগুটের শয্যাসঙ্গিনী হতে হল।

হারেমস্থ যুবতীবৃন্দের বিশেষ কারুর প্রতি ফাগুটের কোনকালেই বিশেষ কোন দুর্বলতা বা পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়নি। বিকৃত যৌনমানস সম্পন্ন এই দানব, বিশেষ করে যুবতীদের জঘন্য ভাবে নিপীড়ন করেই বুঝি শান্তি পেত সমধিক। আশ্চর্য মেয়েগুলোও সে সব অত্যাচার বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করে যেত।

এর দুটো কারণ ছিল। এক : যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে থাকা খাওয়ার অভাবজনিত অবস্থায়, ফাগুট তার মেয়েদের তুলনামূলক ভাবে ভাল মাইনে দিত, ভাল খাওয়া দিত, থাকবার বাসস্থানও দিত। দুই : কিছু মেয়ে ওকে বেশ পছন্দই করত। এর কারণ হয়ত অদ্ভুত, তবু সত্যি। ওর কদর্য চেহারা, ওর কর্কশ কণ্ঠ, ওর নিষ্ঠুর ব্যবহার, সর্বোপরি ওর দানবীয় ব্যভিচার কিছু বিকৃতমনা মেয়ের ওর প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ। এই কারণে মেয়েদের মধ্যে ওকে নিয়ে রেষারেষি, ঈর্ষা, কলহ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ঝামেলার উদ্রেক প্রায়শঃই হত। তবে ফাগুটের ভয়ে, তার বহিঃপ্রকাশ বিশেষ একটা হত না।

নতুন মেয়ে হানা-কে নিয়েই সেবার ঝামেলার শুরু হল। ফ্যাকাসে তন্বী এই মেয়েটি ঐ দানবের সবকিছুর প্রেমেই বুঝি পড়েছিল। এদিকে হানার আগমনের তিন দিন বাদেই শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে ফাগুট অপর একটি মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তা দেখে রাগে দুঃখে অভিমানে হানা কেঁদে বিছানা বালিশ ভিজিয়ে দিল প্রথমটা। তাতেও তার ক্রোধ প্রশমিত হল না। প্রচণ্ড রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সে ছুটে চলে গেল পানশালার হলঘরে। অতঃপর, ফাগুটকে উদ্দেশ্য করে, তুমি একটি পশু, জঘন্য নরপশু, তোমায় আমি বিষের মত ঘৃণা করি ইত্যাদি, ইত্যাদি ক্রন্দন মাখা চীৎকারান্তে, বার-কাউন্টার থেকে বোতল গ্লাস তুলে নিয়ে মনিবের দিকে বৃষ্টির মত ছুঁড়তে আরম্ভ করলো।

মাথা বাঁচিয়ে ত্রস্তে এগিয়ে এসে ফাগুট ঐ পলকা মেয়েটিকে

দুহাতে তুলে ধরে এক ঝটকায় বাইরে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। ধপাস্ শব্দে হানা গিয়ে আছড়ে পড়লো পাশের কাঠের দেওয়ালে।

—অ্যালবার্ট! এক্ষুনি এটাকে বাইরে বের করে দাও। বলে বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে ফাওট সোজা চলে গেল নিজের ঘরে নতুন শয্যাসঙ্গিনী নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বিকট হাসিধ্বনি শোনা যেতে লাগলো ঘরের মধ্যে থেকে, আর এদিকে তখন সর্বাঙ্গে আহত হানা কোনক্রমে নিজ বিছানায় এসে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়লো।

এর পাঁচ দিন বাদে মিউনিখ পুলিশ পুনরায় এল ফাওটের এই পানশালায়। জেরা অন্তে ফিরে গিয়ে তারা ডাইরীতে লিখলো:

নিরুদ্দিষ্টা মেয়ে মেরীর ব্যাপারে পুনরায় উইলহেল্‌ম্ ফাওটকে জেরা করা হয়। নতুন কোন কথা লোকটার মুখ থেকে শোনা গেল না। সে পূর্বের মতই বলে মেরী রাত ২টায় চলে গেছে। তার অপরাপর মেয়ে কর্মচারীদের কাছে কিন্তু বিপরীত সাক্ষ্য পাওয়া গেল। তাদের মতে মেরীকে রাত তিনটে বা তারও পর পর্যন্ত ফাওটের সঙ্গে নিরালায় থাকতে দেখা গেছে। ফাওট একটি ছোট ডোবায় কুমীর পুষে রেখেছে। সেই কুমীরগুলোকে সে নিয়মিত জ্যান্ত জীবজন্তু খাওয়ায়। লোকটাকে এই নিষ্ঠুর সামাজিক অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা যায়।

তৃতীয় বার পুলিশ এল উইলহেল্‌ম্ ফাওটের কাছে। অনেক প্রশ্ন এবার। রোজ নাম্নী মেয়েটি কোথায়? এন্টয়নেট কোথায়? কোথায় গেছে অ্যানেটি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ফাওট বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করে বলে, যে সব মেয়ে আমার চাকুরি ছেড়ে চলে গেছে তাদের খবরাখবর রাখা আমার প্রয়োজন কি? কি করে বলব তারা এখন কোথায় বসবাস করছে বা কি করছে।

কিন্তু কেন তারা চাকুরি ছেড়ে চলে গেল?

—কিছু মেয়েকে আমি বরখাস্ত করেছি। কিছু মেয়ে নিজ ইচ্ছায় চলে গেছে। সুতরাং কে কোথায় গেছে বা আছে আমার তা জানবার

কথা নয়। ওয়েট্রেস আসে, ওয়েট্রেস যায়। তাদের সম্বন্ধে আমা অতো মাথা ঘামালে চলে না।

মেয়েদের এবার বেশী করে জেরা করা হল। কোন ফল হল না। কুৎসিত বুড়ো অ্যালবার্ট গেস্লারকে প্রশ্ন করা হল। না কোন কিছু উদ্ঘাটিত হল না বা বের করা গেল না কুৎসিত বুড়োটার কাছ থেকে

ওরা জুলায় পুনরায় পড়ল এলিজের পালা। ফাগুট ওকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। সেদিন আর বিয়ার নয়, নির্জল ব্র্যাণ্ডি গিলতে লাগলো দানবটি। ওর সেদিনকার দেহজ ক্ষুধাতৃষ্ণার বুঝি সীমা পরিসীমা রইল না। রাত চারটের সময় ফাগুট ওকে রেহাই দিয়ে দরজা খুলে বললো, হানাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এলিজ গিয়ে ফ্যাকাসে, দুর্বলস্বাস্থী মেয়ে হানাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে পাঠিয়ে দিল কামোন্মত্ত মাতাল ফাগুটের ঘরে। তারপর ক্লান্ত দুরমুজ করা শরীর নিয়ে সে নিজ বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ওর ডান হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল ফাগুট নেশার মাথায়। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুম ভেঙে গেল হাতের দারুণ ব্যথায়। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বিছানায়, তার আলোয় দেখলো হাতটায় কালশিটে পড়েছে। এলিজ উঠে পড়ে পানশালার দিকে গেল বরফ আনতে। হাতে একটু বরফ লাগানো দরকার নয়ত ব্যথা কমবে না।

পথে বেরিয়েই কিরকম একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ কানে এল কুমীর-ডোবার দিক থেকে। ফিরে সেদিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তাতে সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে ভয়াবহ এক আর্ত-চীৎকার বেরিয়ে এল রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে।

জ্যোৎস্নালোকে সে সভয়ে দেখল হানার উলঙ্গ দেহটা ডোবার তীরে পড়ে আছে। তার দুটো হাত বগল থেকে নেই। সম্পূর্ণ কেটে নেওয়া হয়েছে। মুখে বীভৎস হাসি নিয়ে সেই মেয়েটির দেহের পানে ঝুঁকে রয়েছে কুৎসিত বুড়ো অ্যালবার্ট গেস্লার। একটা লোহার করাত নিয়ে সে পশুটা মৃতা হানার পা কাটছিল।

পাশে দাঁড়িয়ে দানব ফাওউট মেয়েটির ছিন্ন অঙ্গ ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাওয়াচ্ছিল ডোবার জলে মুখ তুলে থাকা কুমীরগুলিকে।

এলিজের আর্তচীৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফাওউট তার দিকে ছুটে গেল। এলিজও চরম আতঙ্কে পানশালার দিকে ছুটতে লাগলো, মুখে 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' আর্তনাদ করতে করতে। সেখান থেকে রাস্তা, মিউখিন অভিমুখের রাস্তা ধরে এলিজ ছুটতে লাগলো প্রাণভয়ে, পেছনে পেছনে দৈত্য ফাওউটও ছুটছে। ওদের পেছনে কাঁপত হাতে সেই কুৎসিত বুড়ো গেস্লারও থপথপ করে দৌড়ে আসছিল।

কোন কিছু না ভেবেই এলিজ ছুটছিল। হয়ত সে দশ মাইল ছুটে মিউনিখে পৌঁছে যেত। ফাওউট ছিল বেহুদ্দ মত্তাবস্থায়। টলতে টলতে ছুটতে ছুটতে কতবার সে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়লো কিন্তু ফের উঠে প্রবল বিক্রমে মেয়েটির পেছনে তাড়া করে দৌড়তে লাগলো। শত হলেও মেয়ে। কতক্ষণ পারবে। তার উপরে ভয়ে সে ছিল আধমরা। আধ মাইলের মধ্যেই দানব এসে ওকে বিশাল থাবা দিয়ে কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে মুহূর্তে কাঁধে তুলে নিল। পরমুহূর্তে আছাড় মারলো মাটিতে। মুখে একটা রুমাল গুজে দিয়ে মেয়েটির চিৎকার স্তব্ধ করে দিল। তারপর আরেক ঝটকায় মেয়েটাকে মাটি থেকে কাঁধে তুলে নিয়ে পেছন দিয়ে চললো কুমীর ডোবার দিকে।

অশেষ ভাগ্যবল ছিল এলিজের, তাই এই দেখা ও পলায়ন পর্ব ঘটতে পাঁচ ছয় মিনিট সময় লেগেছিল। কারণ ওর সেই অনিচ্ছাকৃত আর্তচীৎকার শুনে, ওর সহকর্মী মেয়েদের ঘুম যায় ভেঙে, তারা লাফ দিয়ে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারে এবং উক্ত সমস্ত ভয়াবহ ঘটনাটি সভয়ে প্রত্যক্ষ করে।

কম্পিত দেহে আতঙ্কিত মনে তারা মুহূর্তে যথাকর্তব্য স্থির করে ফেলে। এবং তৎক্ষণাৎ যুগপৎ তারা ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে, রাস্তা এড়িয়ে মেঠো পথ দিয়ে, প্রায় আধ মাইল দূরের একটি ফার্ম বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এলিজকে ধরার প্রচেষ্টায় ফাওউট ও গেস্লার এতই মত্ত ও ব্যস্ত

ছিল যে ঐ মেয়েগুলোর পালিয়ে যাওয়া উভয়ের কারুরই নজর পড়েনি।

এদিকে ফাগুট এলিজকে কাঁধে নিয়ে সোজা চললো কুমীর-ডোবার দিকে। ডান হাত দিয়ে মেয়েটির মুখে গোঁজা রুমালটি সজোরে চেপে ধরেছিল সে। দমবন্ধ হয়ে আসছিল এলিজের। প্রথমটা প্রায় অচেতন নিশ্চল ভাবে পড়ে ছিল সে। কিন্তু—যে-ই সে আড়চোখে দেখলে। তাকে নিয়ে আসা হয়েছে ভয়ংকর কুমীর অধ্যুষিত সেই সিমেণ্ট-পুল-এর কাছে, তক্ষুনি তার সহজাত জৈবিক প্রেরণায় সে হাতপা ছুঁড়ে লাথি চড় ঘুষি চালাতে লাগল ফাগুটকে কাঁধের ওপর ঝুলন্ত অবস্থাতেই। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো নিজেকে দানবের হাত থেকে মুক্ত করবার।

ফাগুট গর্জে উঠলো, অ্যালবার্ট, শীগ্গির একটা দড়ি নিয়ে এস। এই কুত্তিটা আমার হাত কামড়ে ধরেছে।

শুনে প্রবল গোঙানী সহকারে এলিজ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। মুখে রুমাল গোঁজা থাকা এক অদ্ভুত চাপা আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। ইতিমধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে কুঁজো বুড়ো একটা মোটা দড়ি নিয়ে এল। আর মিনিটখানেকের ভেতর ফাগুট এলিজকে আষ্টেপৃষ্ঠে সেই দড়ি দিয়ে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখলো।

এবার ফিরে তাকিয়ে অদূরে মাটিতে পড়ে থাকা হাতপাহীন হানার রক্তাক্ত মৃত ধড়টাকে ফাগুট একটানে তুলে নিয়ে সেই স্লিপের উপর ছুঁড়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বীভৎসদর্শন খণ্ডিত রমণীদেহ পিছলে পিছলে গিয়ে ডোবার জলে পড়লো এবং মুহূর্তে কুমীরগুলির পেটে টুকরো টুকরো হয়ে বিলীন হল।

দানব এবার কোমরবন্ধ থেকে বিশাল এক ছুরি বের করে এলিজের দিকে ফিরে এল।

নেহাত নিয়তি। নয়ত ঠিক সেই মুহূর্তেই গেস্লারের পানশালা বাড়ির মেয়েদের শোবার কুটিরের খোলা দরজার পানে নজরই বা পড়বে কেন, আর সে চেঁচিয়েই বা উঠবে কেন, দেখুন দেখুন স্যার

ওদের দরজা খোলা। বোধকরি ওরা পালিয়েছে। কি সর্বনাশ।

ফাগুট মুহূর্তখানেক থেমে ইতস্তত: করলো। তারপর হাতের ছুরি নিয়েই মত্ত টলমল অবস্থায় দৌড়ে গেল মেয়েদের সেই আবাসঘরের দিকে। পেছন পেছন প্রভুভক্ত কুঁজো বুড়োও ছুটতে লাগলো কুকুরের মত।

ঘরে ঢুকে তক্ষুনি বেরিয়ে এল ফাগুট। চিৎকার করে কুঁজো বুড়োকে তার অকর্মণ্যতার জন্যে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। আবার দৌড়ে এল কুমীর-ডোবার কাছে যেখানে এলিজ দড়িবাধা অবস্থায় পড়ে আছে।

—এই ব্যাটা কুকুরের বাচ্চা অ্যালবার্ট। শোন্। যেখান থেকে পারিস ঐ মেয়েগুলিকে খুঁজে নিয়ে আয়, ধরে নিয়ে আয়, বজ্রকণ্ঠে আদেশ করল দানব।

কুঁজোবুড়ো দুলতে দুলতে দৌড়ে চলে গেল রাস্তার ওপর। তারপর চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে বিদ্‌ঘুটে কণ্ঠস্বরে ডাকলো, ওগো মেয়েরা শুনছ কোথায় তোমরা বাছা। চলে এস ঘরে। মিঃ ফাগুট কিন্তু ভীষণ রেগে গেছে ভাল চাও তো এক্ষুনি চলে এস সব।

এদিকে ফাগুট এবার নীচু হয়ে অর্ধচেতন এলিজকে ফের কোলে তুলে নিল। একে মত্তাবস্থা, তার ওপর সাম্প্রতিক দৌড়ঝাঁপ, সর্বোপরি মেয়েটির ওজনও কম নয়, তাই ক্লান্ত এঁকেবেঁকে যাওয়া পদক্ষেপে সে স্লিপটার দিকে এগোতে লাগলো। এলিজের অন্তিমকাল উপস্থিত। সে ঈশ্বরের নাম বুঝি স্মরণ করছিল তখন।

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল পুলিশ-কার্-এর সুতীক্ষ্ণ সাইরেন ঠিক পানশালা বাড়ির সামনে। আর সঙ্গে সঙ্গে অজস্র শক্তিশালী সার্চ-লাইটে চতুর্দিকে যেন দিন হয়ে গেল।

ফাগুট হকচকিয়ে গিয়ে বারেক ইতস্তত: করল। অমনি একটি সার্চলাইটের সরাসরি ফোকাস তার ওপর পড়ে স্থির হয়ে রইল। চোখ ঝলসানো আলো থেকে বাঁচবার জন্য সে মুখ ফেরালো। কোলে রয়েছে হাত-পা বাঁধা মেয়েটি। সেই অবস্থায় সে মেয়েদের আবাস-

স্থলের দিকে দৌড়তে লাগলো। দ্বিতীয় ফোকাস পড়লো তার দেহে তারপর তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম সব ফোকাস ওকে অনুসরণ করে চললো। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পুলিশরাও পেছু নিল তার।

মেয়েদের ঘরের কাছে গিয়ে সহসা থেমে পেছন ফিরল ফাওট। তার প্লাস্টিক সার্জারী করা বীভৎস মুখটা তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হল। পরক্ষণে সে এলিজকে কোল থেকে মাটিতে প্রায় ধপ্ শব্দে ফেলে দিয়ে দুহাতে আলোর ঝলকানি থেকে বাঁচবার মানসে মুখ ঢেকে অতি দ্রুত দৌড়ে যেতে লাগলো সেই কুমীরভর্তি ডোবার দিকে। পুলিশ দলও ছুটলো তার পেছন পেছন।

কিন্তু হায় পুলিসরা এ জীবনে তাকে ধরতে সক্ষম হল না। দানব চেহারার কয়েকটি সুদীর্ঘ লাফের সাহায্যে সে চোখের পলকে পৌঁছে গেল মরণ-পুল-এর তীরে। অতঃপর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে, একটি কথাও না বলে, কোন দিকে না তাকিয়ে, শেষ লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডোবার জলে।

মরণঝাঁপ। অতি দ্রুতই তার আদরের পোষা কুমীরেরা তাকে টুকরো টুকরো করে গলাধঃকরণ করে নিমেষে পরপারে পাঠিয়ে দিল। ডোবার জল টকটকে লাল হয়ে গেল।

দানবের জীবন শেষ হলেও কাহিনী কিন্তু এখানে শেষ হল না পুরোপুরি। হয়ত পুরোপুরি শেষ কোনদিনই হবে না।

পুলিশের মোচড়ে এবং পাগলের 'গো-বধে আনন্দে'র মত মূঢ় গর্বে দানবের সহকারী কীতিধর কুৎসিতদর্শন কুঁজো বুড়ো গেস্লার তার মালিক ফাওটের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়ে যায়।

সব মিলিয়ে প্রায় ৩০টি যুবতী নারীকে না কি খাওয়ানো হয়েছে কুমীর দিয়ে। সঠিক সংখ্যা হয়ত কোনদিনই যানা জাবে না। বুড়োর বাচনিক শুনে পুলিশ নানা সূত্রে সন্ধান করে প্রায় সাতাশটি মেয়ের পরিচয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় যারা ফাওটের বিকৃত নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছে কুমীরের পেটে গিয়ে। অধিকাংশই জ্যান্ত অবস্থায় নৃশংস মৃত্যু হয়েছে তাদের।

সাতাশ, না সাতাত্তর নাকি সাতানব্বুই ? কে জানে এ তালিকার শেষ কোথায়।

কুমীরগুলোকে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর ঐ পানশালাকে ভেঙে ফেলে সেখানে বর্তমানে গড়ে উঠেছে এক পেট্রল পাম্প। পাশেই সেই কুখ্যাত ডোবাটি কুমীরশূন্য খালি অবস্থায় পড়ে আছে। পাম্পের কর্মী ছেলেরা বিভিন্ন পথিকের কাছে এই লোমর্ষক সত্যি ঘটনা সালংকারে বর্ণনা করে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই একটু অতিরঞ্জন থাকে তাতে। তাদের মুখে এখন পর্যন্ত মৃত মেয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০টি। সন্দেহ কি দিনকে দিন এ সংখ্যা ক্রমেই আরও বেড়ে যাবে।

বুড়ো অ্যালবার্ট গেস্লার বছর দুই মিউনিখের এক পাগলা গারদে থাকবার পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মাথা খারাপ না হলে সে ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে যেতে কিছুতেই পারতো না।

আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নবজীবন পেয়ে যুবতী মেয়ে এলিজ ফিরে যায় মিউনিখে এবং কালক্রমে জনারণ্যে মিশে যায়।

ডাক্তার বর্গের আজব ক্লিনিক

ইয়োরোপের শহর নগরের মধ্যে, জেনেভাই হল একমাত্র প্রাচীন শহর, যেখানে আভিজাত্যের প্রতি সর্বাধিক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। ওখানকার সুখী সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্যবান নাগরিকগণ সদাসন্তুষ্ট জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সেক্স অর্থাৎ যৌনবিষয়ক কোন কিছু যদি বা কদাচিৎ প্রকাশ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেক্স সংক্রান্ত অশোভন সবকিছুকেই এদের ভদ্র সম্ভ্রান্ত মানসিকতা কখনো বরদাস্ত করে না।

এ হেন রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন সুইস নগরী জেনেভা সেদিন প্রকৃতই চমকে উঠলো, শক্ পেল, যেদিন সেই ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের এক বসন্তকালে সেখানে এসে উদয় হল তথাকথিত "প্রফেসর" হোরেস ক্যাসপার বর্গ নামক এক ব্যক্তি। কেউ জানে না যে এই লোকটি মার্কিন দেশের প্রখ্যাত সিংসিং ও অপরাপর কম প্রখ্যাত কারাগার-সমূহের প্রাক্তন কয়েদী।

শুধু এল না, এসে এই "প্রফেসর" এই ভদ্র জনাকীর্ণ নাগরিকদের মধ্যে সেক্সকে তার লুকায়িত গুপ্ত স্থান থেকে টেনে বের করে এদেশের যাবতীয় সংবাদপত্রের শিরোনাম করে ছেড়ে দিল।

প্রফেসর বর্গ। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ, মুখে ভ্যানডাইক মার্কা ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, ঈগলের মত তীক্ষ্ণ তীব্র অনুসন্ধানী দুটি চোখভরা দৃষ্টি। জোঁকের মত একজোড়া ভ্রূ। ডবল ব্রেস্ট বিজনেস স্যুট পরা এই লোকটিকে দেখলে একটি আস্ত শয়তান ছাড়া কিছু মনে হয় না।

অচিরেই এই মিঃ বর্গ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে, একথা জানিয়ে দিল যে সে ৮নং প্লেস ডি বাগুইস-এ একটি অভিনব 'ম্যারেজ কাউন্সেলিং সার্ভিস'-এর অফিস খুলছে।

স্থানীয় সাংবাদিকরা বিস্মিত। এটা হবে কি ধরনের 'সার্ভিস?' বলছি বলছি, সবই খুলে বলছি মশাইরা। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মিঃ বর্গ

বলে যায়, দেখুন, সেক্সই হল দুনিয়ার যাবতীয় ঝঞ্ঝাটের মূল। তাই, আমার থিয়োরী হল, ভুয়া সতীত্ব, মিথ্যে লজ্জা সংকোচ, এবং প্রেম প্রণয় কামের প্রতি শিশুসুলভ মনোবৃত্তিঅধিকাংশ নরনারীর জীবনকে বিকল করে তোলে, ফলে তারা শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং সর্বোপরি তারা প্রায় ক্ষেত্রেই আত্মহত্যার জঘন্য প্রক্রিয়ায় মেতে উঠে প্রাণ বিসর্জন দেয়। বলে প্রফেসর বর্গ বিরাট এক চুরুট ধরিয়ে প্রবলবেগে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিটিমিটি হাসতে থাকে সাংবাদিকদের পানে তাকিয়ে।

লজ্জায় কিছুটা আরক্ত, জনৈক মুখচোরা যুবক সাংবাদিক সসংকোচে বলে ওঠে, মানে, মানে আপনি এই ব্যাপারটাকে অর্থাৎ এই সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন? এখানে প্রতিষ্ঠিত আপনার ক্লিনিক-এর উদ্দেশ্যই বা কি হবে?

মিষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হেসে 'প্রফেসর' বললে, আই অ্যাম গ্ল্যাড যে আপনি এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন। এখুনি আমি মিসেস ডরোথি ওয়েনরাইটকে এখানে উপস্থিত করাচ্ছি। তিনি আমার প্রথম রোগিনীদের অন্যতমাও বটেন। সেই সুখীতৃপ্ত ভদ্রমহিলাই আমার সুইজারল্যাণ্ডে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহকারে অর্থাৎ এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সব কিছু বিবৃত করবেন আপনাদের কাছে।

কয়েক মিনিটে মধ্যেই মিসেস ওয়েন রাইট এসে সে ঘরে প্রবেশ করল। বার্ন-এর এর তরুণ সাংবাদিক তো সহসা শিস্ দিয়েই উঠল মহিলাটির রূপ দর্শন করে। উপস্থিত প্রতিটি সাংবাদিকই ভদ্রমহিলার দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত এবং উদ্গ্রীব হয়ে পড়ল সন্দেহ নেই।

তরুণীর বয়েস সাতাশ আঠাশ। চোখের দৃষ্টি কখনো উদাস, কখনো মাদকতাময়, কখনো শূন্য, কখনো তীক্ষ্ণ সন্ধানী। নীল সিল্কের অত্যন্ত আঁটোসাঁটো গাউনে শারীরিক যাবতীয় আকর্ষণ যারপরনাই পরিস্ফুট হয়েছে যুবতী দেহের। কথা শুনে, গলার স্বর শুনে সাংবাদিকরা চমকে উঠলো। এ কণ্ঠস্বর যেন সারা দেহমনে সুড়সুড়ি

দেয়। তবে কি কণ্ঠস্বরে ও যৌন আকর্ষণ বিদ্যমান?

—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজ মিসেস ওয়েনরাইটকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। বহু ফ্রিজিড (কামশীতল) মহিলার মত ইনিও আমার দ্বারস্থ হয়েছিলেন উপযুক্ত মন্ত্রণা এবং চিকিৎসার জন্য। এই পোর্টফলিওর টাইপ করা তিরিশ পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমি ওর কেস্‌টাকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছি। এটাতে পাবেন কিভাবে আমাদের আত্মার সঙ্গে আমাদের প্রাণীজ প্রবৃত্তির সংঘর্ষ অহরহই লেগে থাকে। মাই ডিয়ার ওয়েনরাইট, এবার তুমি উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বল।

অতঃপর সেই তরুণী দ্বিধাহীন ভাষায় সেই অতি ভদ্র সংযত স্যুইস সাংবাদিকদের কাছে, সুনির্বাচিত ডাক্তারী শব্দ সহযোগে বর্ণনা করে যায় কিভাবে হোরেস বর্গ-এর সুচিকিৎসায় এক উদাসীন, বীতস্পৃহ, বিগতকাম তরুণী থেকে সে চঞ্চল যৌনোচ্ছলা কামনাবতী পূর্ণ যুবতীতে রূপান্তরিতা হয়ে গিয়েছে।

এর পর আরও এমন কিছু তথ্য বলে যায় তরুণী যাতে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখ চোখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। শুধু কথা নয়, অবশেষে 'প্রফেসর' হোরেস বর্গের সঙ্গে লালসাপ্লুত আলিঙ্গনাদির দৃশ্যাভিনয়ের দ্বারা সকলকে নিদারুণ বিব্রত করে তুললো এই মহিলাটি।

জনৈক সাংবাদিক আচমকা এক প্রশ্ন করে বসে যুবতীকে।

—আচ্ছা মিসেস ওয়েনরাইট, জানতে পারি কি আপনার স্বামী কোথায়?

অসংকোচে বলে গেল তরুণী, প্রফেসর বর্গের চিকিৎসার পর দেখা গেল আমার কাছে আমার স্বামী প্রকৃতই অনুপযোগী, অর্থাৎ অক্ষম। তাই স্যার, আমার শারীরিক জাগরণের রূপকার ওই মিঃ বর্গ-এর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আমার স্বামী, আমার সন্তানাদি সব কিছু পরিত্যাগ করে চলে এসেছি ওর কাছে। যাতে আমার মত যৌনতৃপ্তি অপরাপর ফ্রিজিড নারীরাও লাভ

করে, সেই মহান কাজে ওকে সাহায্য করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি।

সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত ৮৬ বৎসর বয়স্ক অ্যাডালবার্ট গ্রুবার-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অতি বৃদ্ধ পক্বকেশ ক্ষীণদৃষ্টি যখন এ কাহিনী বলছিলেন মনে হচ্ছিল যেন ৬০'৬১ বছর আগেকার ঘটনা নয়, এই সেদিনকার ঘটনা এটা,•সবই তাঁর চোখের সামনে ভাসছে যেন। বলতে বলতে হের গ্রুবার এখনো লাল হয়ে উঠছিলেন।

—দেখুন, এর পর মহিলাটি সেদিন অঙ্গ থেকে অধিকাংশ পোশাক খুলে নিয়ে পরীক্ষা-টেবিলে শুয়ে পড়লেন। আমরা যেন ছাত্র, এমনিভাবে 'প্রফেসার' বর্গ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় নরনারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যৌনজীবনের উপর দেহ ও মনের প্রভাব এবং নরনারীর মিলন সংক্রান্ত অজস্র গোপন তথ্য উদাত্ত কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করে গেলেন। ভদ্রমহিলাও বক্তৃতানুযায়ী প্রয়োজনানুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হেলন ও সঞ্চালনের দ্বারা 'প্রফেসার'-কে সাহায্য করে গেলেন।

বৃদ্ধ গ্রুবারকে প্রশ্ন করা হল, আচ্ছা হের, আপনি কি প্রফেসর বর্গের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেছিলেন সেদিন?

বৃদ্ধের মুখ কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ফোকলা মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, তা স্যার, সেই তাজা তরুণ বয়সে একটু হয়েছিল বৈকি। পরস্ত্রীদের নিয়ে...। তবে ভদ্রলোকের শেষ পরিণাম দেখে উক্ত মনোভাব আমার নিভে গিয়েছিল। সে পরিণাম বড় ভয়াবহ। অবশ্য ওর ক্ষেত্রে ওই বুক কাঁপানো পরিণামই বুঝি সাধনোচিত ছিল।

আশ্চর্য মানুষ এই হোরেস বর্গ। সুদূর আমেরিকার দিকে দিকে হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো কাগজের নথিপত্রে ওর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কোর্টে কাছারিতে থানায় কারাগারের ফাইলে ফাইলে। বর্গ বিজ্ঞানী নয়, সে একজন প্রবঞ্চক মাত্র। কিন্তু ওর একটা অদ্ভুত

ক্ষমতা ছিল স্মৃতিশক্তি ও মেধা। কয়েকখানা ডাক্তারী বই ওর পাতার পর পাতা কণ্ঠস্থ ছিল।

সিংসিং জেলে প্রথম যায় "সাইকো-গাইরো বেল্ট কর্পোরেশন" নামক অস্তিত্বহীন ভুয়া এক কোম্পানির সৌজন্যে। এই কোম্পানির অলৌকিক "বেল্ট" পরিধান করে নাকি অজস্র ক্যানসার ও নিউমোনিয়া রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে—এই বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রায় ৪৫,০০০ ডলার মূল্যের তথাকথিত 'বেল্ট' বিক্রি করেছিল সে বিভিন্ন রাজ্যে।

এরপর শিকাগোতে সে সর্বপ্রথম 'ম্যারেজ কাউন্সেলিং সার্ভিস' খোলে। সে সময় থেকেই সে নারীদের কামশীতলতা এবং অপরাপর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করতে থাকে। এর জন্য অবশ্য যে প্রকার দারুণ চাতুর্য আর গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তা এই বর্গ-এর ছিল। ওর চেহারা যদিও আদৌ সুন্দর ছিল না এবং কিছুটা নার্ভাস ধরনের মানুষও ছিল তবু অদ্ভুত বাক্‌চাতুর্যেই সে তার সুদর্শন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সদাসর্বদা হার মানিয়ে দিত। বিশেষ করে নারীদের ওপরে তার প্রভাব যেন সম্মোহক প্রভাবের কাজ করত। কিছুদিনের মধ্যেই স্ব-নির্বাচিত ও স্বনিয়োজিত মেডিসিন, সাইকোলজি এবং ভদ্র-সমাজে অনুচ্চারিত নতুন শব্দ 'সেক্সোলজি'র ডাক্তার হয়ে বসলো সে। এবং অচিরেই নাম যশ অর্থ পসার সবই হু হু করে বেড়ে গেল।

এর পর নিজেকে 'প্রফেসর' রূপে অভিহিত করল বর্গ। জনৈক সুরা কোম্পানির মালিক ওটো কেলার-এর স্ত্রী ডরোথী কেলারকে চিকিৎসা করবার পরেই বর্গের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। উক্ত ৬৪ বৎসর বয়স্ক ওটো কেলার নাকি স্নায়বিক দুর্বলতা জাতীয় কি সব রোগে ভুগছিল, এ হল তার ২৮ বছর বয়স্কা স্ত্রী ডরোথীর অভিযোগ। অপর দিকে বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলনে ডরোথীর ছিল প্রবল অনীহা এবং সর্বোপরি চরম আতঙ্কজনিত এক ভীতিভাব।

ফলে, এই বর্গের অধীনে উক্ত ডরোথী কেলার এমন কয়েকটি পর্যায় ও প্রক্রিয়ায় চিকিৎসিত হতে লাগলো যে সম্পর্কে শহরের বিভিন্ন বার-এ ও বহু ড্রইংরুমে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসাহাসি করে ফিসফিসিয়ে

আলোচিত হতে লাগলো অনেক কথা। তিনমাস চিকিৎসান্তে নবজীবন ও নবযৌনজীবন ও যৌবন লাভ করে ডরোথী একদা গিয়ে উপস্থিত হল স্বামীর গৃহে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবার পরই পুনরায় বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি অব্যক্ত এক ঘৃণায় ডরোথীর উৎসাহ উদ্দীপনা এক ফুঁয়ে নিভে গিয়ে সে পূর্বেকার মত ফের ফ্রিজিড ওয়াইফ-এ পরিণত হয়ে গেল। ডরোথীও বড় ঘরের মেয়ে, তার বাবা স্বনামধন্য এক ব্যবসায়ী সাইরাস ওয়েনরাইট। কি হল সেদিন রাত্রে, ঘুমন্ত স্বামীকে ডরোথী এক ছুরিকা দিয়ে আক্রমণ করে মারাত্মক জখম করে ফেলল। হাসপাতালে নেবার পূর্বেই প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে বৃদ্ধ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক প্রাণত্যাগ করল।

মানসিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে থাকাকালীন ডরোথী ওয়েনরাইট কেলার তার নার্সকে আচমকা আক্রমণ করে তাকে বেঁধে ফেলে। পরে নার্সের পোশাক পরে বাইরে এসে ২০,০০০ ডলার এর চেক ক্যাশ করে তার নতুন প্রেমিক হোরেস বর্গ-এর সঙ্গে নিউইয়র্কের পথে রওনা হয়ে যায় চুপিসারে।

অবশেষে এই যুগল, ১৯০৭ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী জাহাজে উঠে ইয়োরোপের পথে পাড়ি জমায়।

এক মহাদেশ ছেড়ে আরেক মহাদেশে এল পরম প্রবঞ্চক একজন হাতুড়ে চিকিৎসক, সঙ্গে নিয়ে পরস্ত্রী এক সহচরী। শেষের শুরু এখানেই। সুচতুর বর্গ বেছে নিল এমন একটি দেশ যে সুইজারল্যাণ্ড হল স্যানিয়টোরিয়াম, ক্লিনিক ইত্যাদিতে আকীর্ণ এবং যেখানে সাধারণতঃ আশ্রয় নেয় অসুখী একক নারীবৃন্দ। নিজেকে ডাক্তার বলে জাহির বা দাবি না করে বর্গ শুধু 'বিবাহিত নরনারীর উপদেষ্টা' হিসেবে জেনেভা নগরীতে সুইচ্ আইনকে কদলী প্রদর্শন করে, এই অভিনব ব্যবসা শুরু করে দিল।

কুমারী উপাধি 'ওয়েনরাইট' গ্রহণ করে ডরোথী মন্ত্রমুগ্ধার মত এই তথাকথিত 'প্রফেসারের' সঙ্গে একাত্মভাবে লেগে রইল। প্রেমিকা

স্বেচ্ছায় ওকে ১৮,০০০ ডলার দিল অফিস খোলবার জন্য। বর্গ সংবাদিক সম্মেলন ডেকে দৃষ্টান্তসহ সব কিছু দেখিয়ে এবং বক্তৃতা করে এই কথাই বুঝিয়ে দিল যে সে যে কোন কামে বীতস্পৃহ ও কাম-শীতল রমণীকে তার অভিনব চিকিৎসার দ্বারা পুনরায় চঞ্চলা, কামনাবতী ও লালসাময়ীতে রূপান্তরিতা করতে সক্ষম। সে সব কথা ওখানকার সংবাদপত্রাদিতে ফলাও করে মুদ্রিত হল।

এই প্রচারের ফলে অজস্র চিঠিপত্র হু হু করে আসতে লাগলো বর্গের অফিসে। অধিকাংশ চিঠিই এল ইয়োরোপের ডজনখানেক দেশের মহিলাদের কাছ থেকে। তারা তাদের দাম্পত্য জীবনকে ডাঃ বর্গে সুচিকিৎসায় পুনর্জীবিত করতে প্রয়াসী। কেন না তাদের মিলিত জীবন যৌন অসঙ্গতির চোরাবালিত পড়ে ডুবে যাবার দাখিল হয়েছে। এসব পত্রের মধ্যে যেগুলিতে বোঝা গেল লেখিকা ধনী নয়, অর্থাৎ প্রচুর কাঁচা পয়সার মালিক নয়, সেসব পত্র সঙ্গে সঙ্গে বর্গ ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

—এই চিঠিটা পড়ে দেখো ডরোথী, উল্লসিতভাবে বর্গ বলে, এটা এসেছে ওয়ারশ'র ম্যাডাম হেলগা মেরীউইকজ্-এর কাছ থেকে। চিঠির কাগজ কি দামী দেখেছ? লিখেছে, ভদ্রমহিলার স্বামী নাকি ও দেশের একজন বস্ত্রশিল্পসম্রাট, নাম থ্যাডিয়াস মেরীউইকজ্। ভদ্রমহিলা এখুনি আসতে প্রস্তুত আমার এ ক্লিনিক-এ। চিকিৎসার জন্য ইনি ৫০,০০০ পোলিশ্ মুদ্রা ব্যয় করতে প্রস্তুত। মাই গড।

সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব করে দেখলো, উক্ত অর্থের পরিমাণ বর্তমান এক্সচেঞ্জ-এর রেট অনুযায়ী দাঁড়াবে প্রায় ৭,০০০ ডলার। প্রথম পেয়িং পেশেন্ট-এর পক্ষে আদৌ মন্দ নয়, কি বল?

ডরোথী তার প্রেমিকের পানে সেই দৃষ্টি নিয়ে তাকালো যা ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট অর্থাৎ কখনো ভাবলেশহীন কখনো বা ঈর্ষা, সন্দেহ ঘৃণায় জীবন্ত, মুখে শুধু বললে, আশা করি মহিলাটি কুৎসিত এবং বয়স্কা হবে হোরেস। কেননা তুমি কোন যুবতী নারী বিশেষ করে

সুন্দরী রূপসীকে চিকিৎসা কর, এটা সম্পূর্ণ আমার না-পছন্দ। আমি সে-কথা চিন্তাও করতে পারি না। বুঝলে ডার্লিং?

ম্যাডাম মেরীউইকজ্‌কে দেখা গেল বেশ তন্বী চেহারার অভিজাত, উচ্চবংশীয়া এবং প্রচুর ধনী জনৈকা পোলিশ ভদ্রমহিলা। বাদামী চুল, গালের হাড় কিছু উঁচু। বয়েস ২৪ বছর। এক সন্তানের জননী। বর্গ-এর তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্নে ভদ্রমহিলা লজ্জায় সংকোচে যার-পরনাই বিব্রত বোধ করছিল। বর্গ তার প্রাইভেট চেম্বারে সংগোপনেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখন।

—থ্যাডিয়াস, যদিও অধিকাংশ সময় তাঁর ঘোড়া, রেস এবং ক্লাব নিয়ে রাত কাটায়, তবুও তাকে আদর্শ ও ভাল স্বামীই বলব। কিন্তু রাত্রে যখন বিছানায় সে আমার সান্নিধ্যে এগিয়ে আসে, বিশ্বাস করুন, আমি—আমি সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করি, মানে বিতৃষ্ণায় শারীরিক প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ি বলা যায়। একবার সে আমাকে স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ি, তাতে থ্যাডিয়াস দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। আরেকবার আমি তার চুম্বন সহ্য করতে না পেরে বাথরুমে পালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। প্লিজ, মিঃ বর্গ, আমায় আপনি বাঁচান, এ রকম চললে আমাদের বিয়ে ভেঙে যাবে। অথচ আমার মনে হয়, আমি তো আমার স্বামীকে সত্যিই ভালবাসি, তাহলে, সে যখন আমায় কামনা করে কাছে আসে, তখন কেন মরতে আমি ওরকম জঘন্য খারাপ ব্যবহার করি!

যদিও সে মোটেই ডাক্তার নয় তবু বর্গ মেডিসিন ও সাইকোলজি বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে রেখেছিল। ফ্রয়েড তার কণ্ঠস্থ। এসব শুনে সে বাঁ হাত দাড়িতে স্থাপন করে আঙুলের টোকা দিল আর অভিব্যক্তিতে আনলো একটা গুরুগম্ভীর প্রফেসনাল্ পোজ, বললে,

—মাই ডিয়ার লেডি। একে আমাদের ডাক্তারী ভাষায় বলে আনরিজল্‌ভ্ ট্রান্সফারেন্স। মানে আপনার মনের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আপনার হতভাগ্য স্বামী ছাড়া অপর কোন এক ব্যক্তির প্রতি

আকণ্ঠ ঘৃণা, যাকে আপনি আদৌ দেখতে পারতেন না, পছন্দ করতে
না।

এইভাবে শুরু করে কঠিন কঠিন ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কঠিন সং
বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় মহিলার কাছে দুর্বোধ্য অনেক কিছু বলে
অবশেষে আশ্বাস দিয়ে বর্গ জানালো, মাভৈঃ, হতাশার কিছু নেই
নিরাময়ের পথ এখনো খোলা আছে ; এখনো ভয়াবহ মানসিক কোন
ক্ষতি হয়ে যায়নি।

ভদ্রমহিলা এত সব গূঢ়তত্ত্ব শুনে প্রায় বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল।
পরে সানুনয় কণ্ঠে বললে,

—তাহলে এখনো আশা আছে বলছেন ? প্লিজ, তা হলে আমায়
সাহায্য করুন। যা বলবেন তাই করতে রাজী আমি।

শেয়ালের মত মুখাকৃতি বর্গের মুখে এক অবৈধ হাসি সঞ্চারিত
হল, সে উঠে গিয়ে চেম্বারের দরজা নিঃশব্দে লক্ করে দিল। তারপর
পোলিশ ভদ্রমহিলা কিছু বুঝে ওঠবার পূর্বেই দেখা গেল সে এই ডাঃ
বর্গের দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় শেটির ওপর শায়িত হয়ে গিয়েছে।
ভেতরে যখন এই আজব চিকিৎসা শুরু হল, বাইরে তখন অধৈর্যভাবে
পায়চারিরতা ডরোথীর পক্ষে ভেতরের কোন কিছু শ্রবণ বা দর্শন করে
গুপ্তচরবৃত্তি করবার উপায় রইল না।

আশ্চর্য কাণ্ড, ম্যাডাম মেরীউইকজ এই অবৈধ চিকিৎসায় সত্যি
সত্যি পরম তৃপ্তি লাভ করল। মুখ ফুটে বলেই ফেললো, ওয়াণ্ডারফুল
আপনি ডাঃ বর্গ। অশেষ ধন্যবাদ। আমি কত বছর পর যে শান্তি
পেলাম, তা আর কি বলব। প্লিজ আমায় আপনার ক্লিনিক-এ থাকতে
দিন। আমার কত কিছু এখানে শেখবার আছে।

—বেশ ম্যাডাম আপনাকে আমি পেশেণ্ট করে নিলাম, বর্গ
প্রফেশনাল পোজ বজায় রেখে জবাব দেয়, যখন চিকিৎসান্তে ফিরে
যাবেন, আমি নিশ্চিত যে আপনার স্বামী খুব খুশী হবেন কামনা-
বাসনাবতী একজন স্ত্রীকে নবরূপে পেয়ে। আমি আমার প্রাথমিক
চিকিৎসা প্রক্রিয়ার দ্বারা এ প্রমাণ আপনাকে দিয়েছি যে আপনি

মূলতঃ ঠিকই আছেন, নারীত্বের এতটুকু অভাব আপনার মধ্যে নেই, চমৎকার সুস্থ ও ভোগবতী মহিলা। তবে ঠিক এই ধরনের চিকিৎসার পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তির উপরই নির্ভর করছে সাফল্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা এবং ততদিন আমাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহৎ স্বার্থে আপনার স্বামীর স্থান সাময়িকভাবে অধিকার করে তাঁরই বকলমে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এইসব চিকিৎসা অবশ্য সময়সাপেক্ষ।

—বেশ তো আপনার যত খুশী প্রয়োজন সময় নিন। আপনার চিকিৎসা পদ্ধতি আমার ভাল লেগেছে, বলে ম্যাডাম মেরীউইকজ তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চেক বুক বের করে লডজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ওপর এক বিরাট অঙ্কের চেকে সই করে দিল।

মনে মনে বুঝি প্রফেসর বর্গ কামনা করল যে তার প্রাক্তন জেল-বন্ধুরা এসে দেখে যাক, বুদ্ধিবলে সে কি অসাধ্য সাধন করে চলেছে। দুনিয়ার রূপবতী ধনী যুবতী মেয়েদের ভোগ করছে এবং সেই বাবদে উলটে তাদের কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক দক্ষিণাও আদায় করছে সে। একেই বলে বুঝি ভেলকিবাজি।

জেনেভাস্থ এই ম্যারেজ ক্লিনিকে সবসুদ্ধ চৌদ্দখানা ঘর ছিল। এর আটটি ব্যবহৃত হত তথাকথিত মহিলা পেশেন্টদের শোবার ঘর হিসেবে, যারা এসে এই "ইনস্টিটুট ফর ম্যারিটাল রিসার্চে" নাম লেখাত। রাঁধুনেসহ চারজন কর্মচারী ছিল। ক্রমে দেখা গেল এতে কুলোচ্ছে না? বর্গের উচ্চাশা হল এমন এক ম্যানসন ভাড়া করার, যেখানে অন্ততঃ চল্লিশজন আবাসিক মহিলা রোগী থাকতে পারে।

বছর খানেকের মধ্যেই বর্গ বুঝতে পারলো যে সে একটি স্বর্ণ-খনির সৃষ্টি করে ফেলেছে, যা তাকে কাম-শীতলতাগ্রস্ত রোগিনীদের ব্যাপারে রিসার্চ চালাবার অজুহাতে প্রচুর নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করবার সুযোগ করে দিয়েছে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়ে বাড়িয়ে ১৩০,০০০ স্বর্ণ ফ্র্যাঙ্ক-এ দাঁড় করিয়েছে।

মাঝে মাঝে ঈর্ষাপরায়ণ ডরোথী যে না ক্ষেপে গেছে এমন নয়। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণে সে ওকে ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছে এই বলে যে

ফের বর্গ' যদি মহিলা রোগিনীদের গাত্র স্পর্শ করে তো তাকে কিন্তু সে ভয়ংকর ও সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। কিন্তু বর্গও ছলাকলা বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ। প্রথমে কথায়, পরে কার্য-প্রণালীতে প্রগাঢ় প্রণয়ের অভিনয়ে তার পক্ষে স্বামিত্যাগিনী ডরোথীকে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তিদানান্তে শান্ত করতে বেশী সময় লাগত না।

পরের জুন মাসে বর্গ' তার ক্লিনিককে চ্যাটো ব্রিগুলিয়ারস্থ ৪০ কামরার এক প্রাসাদোপম বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এল। নীল জল রোন নদীর সামনে অবস্থিত এই প্রাসাদ থেকে নীচে চতুর্দিকের জেনেভা শহর যেন ছবির মত মনে হত। এখান থেকে তুষারশুভ্র মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ও তাদের দুটি খ্যাত শীর্ষ চমৎকার দেখা যেত।

বেশ চলছিল। কিন্তু বিধি বাম। ঝামেলার শুরু হল হেলইস স্প্যাগনোস নামক ২৭ বছরের এক মহিলার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। এ মহিলাটি এথেন্স-এর প্রধান জাহাজ-ব্যবসায়ীর স্ত্রী। আঁটোসাঁটো গড়নের পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী এই মহিলাকে আর যাই হোক 'ফ্রিজিড' বলে আদপেই মনে হয় না। তবে কেন এখানে এসেছে? চোখে মুখে ক্লান্তি, বোঝা যায় মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা চরম অশান্তি প্রবহমান। অথচ দৃষ্টি বা হাবভাবে তাকে পূর্ণ লালসাময়ী রমনী বলেই মনে হচ্ছে?

বর্গ' উৎকর্ণ হল শোনবার জন্য উক্ত মহিলার কাহিনী:

—আমার স্বামী এল্যুথেরিস যদিও আজগুবী রকমের ধনী কিন্তু সে একজন অতি স্থূল রুচিসম্পন্ন মানুষ। কোটি কোটি ডলারের মালিক উপরন্তু তার রয়েছে তিরিশটির ওপর জাহাজ। আমার ওই স্বামীটি নিদারুণ ঈর্ষাপরায়ণ। আমি যদি তার দেহজ প্রেম-প্রণয়ে সাড়া না দিই, তবে সে আমাকে হত্যা করে ফেলবে বলে শাসিয়েছে। কিন্তু জানেন প্রফেসর, আমার এই স্বামীটির গায়ে কি বিচ্ছিরি ছাগলের বোটকা গন্ধ। লোকটা বিছানায় শুয়ে হাঁসের কাঁচা ডিম ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে। সে যখন কামোন্মত্ত লোমশ দেহ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে তখন তাকে মনে হয় কোন বিশালকায়

লোমশ গরিলা বিশেষ। ভয়ে আমি এতটুকু হয়ে যাই। অবশ্য ডাইভোর্সের কথা অচিন্ত্যনীয়। তাহলে আমার নিজের পরিবারই আমাকে পরিত্যাগ করবে, ত্যজ্য করে দেবে। প্লিজ, প্রফেসর আমায় বলে দিন কিভাবে আমি আমার স্বামীর কাছে স্বাভাবিক প্রেমবতী স্ত্রী হতে পারব?

ইতিমধ্যেই প্রফেসর বর্গ' তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত করেছে যারা ক্লিনিকে আসা মহিলাদের তথাকথিত "চিকিৎসা"য় তাকে সাহায্য করে থাকে।

একজনের নাম রাওল স্তি সির, লোকটির ওজন আজগুবী ধরনের, সে একজন টেনিস স্টার। প্যারিসে থাকতে লোকটা নাকি কুখ্যাত পল্লীর পালোয়ানরূপে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম, হেন্ডরিক লুব্বে, আমস্টারডামে এককালে লঞ্চে স্টিমারে কাজ করত। ভ্রাম্যমাণ মেলায় মেলায় মাংসপেশী সঞ্চালন দেখিয়ে ফিরত এই ব্যায়ামবীর মানুষটি। তৃতীয় জনের নাম লুইস ওয়ার্নার, ক্ষীণদেহী একজন ইংরেজ সে। স্মাগলিং-এর অভিযোগে ডার্টমুর-এ একবার জেল খেটেছিল লোকটি।

প্রথমে মনে হয়েছিল রাজযোটক বুঝি। যেমন দেবা, তেমনি দেবী। অর্থাৎ এই গ্রীক রমণী বোধ করি নিঃসীম কামাচারী বর্গ-এর উপযুক্ত দোসর, যোগ্য সঙ্গিনী। কিন্তু কার্যকালে সমুৎপন্নে দেখা গেল সীমাহীন কামনা বাসনার অধিকারিণী এই হেলইস স্প্যাগনোস নামক নারীটিকে তৃপ্তিদান করা বর্গের অসাধ্য। দুঃখের সঙ্গে সে তার এই নতুন পেশেন্টকে ওলন্দাজ লুব্বার হাতে ফেলে রাখলো তিন দিন তিন রাত।

চতুর্থ দিন লুব্বা রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্লান্ত কম্পিত দেহে বেরিয়ে এসে বর্গকে নিবেদন করল, মাইনহিয়ার, ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক। আমায় ক্ষমা করবেন। ওকে বরং ফরাসীদাদার দ্বারা 'চিকিৎসা' করান।

সেও চতুর্থ-দিনের শেষে হাউমাউ করে এসে নিবেদন করল, মন্-ডিউ! মাফ করুন প্রফেসর। এ ধরনের দ্বিতীয় পেশেন্ট আমার কাছে

পাঠালে আমি এ চাকরি ছেড়ে চলে যাব। অকালে প্রাণে মারা পড়ব নাকি স্যার!

মাডাম স্প্যাগনোস নগদ ৪০,০০০ ড্র্যাস্‌মাস্‌ দিয়েছে এ ক্লিনিকে ভরতি ও চিকিৎসিত হবার জন্যে। এটা প্রায় ৮০০০ ডলারের মত। বর্গ বেশ ভড়কে গেল। তার ভুয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং চার চারজন পুরুষ-পুঙ্গবদের সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে এই গ্রীক ভদ্রমহিলার কাছে। গ্রীক কন্যাটি যদিও নিজ স্বামীর কাছে 'কামশীতল' বনে যায়, আসলে সে একজন পরিপূর্ণ নিম্‌ফোম্যানিয়াক। এর পর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী শীর্ণকায় সেই ইংরেজ ওয়ার্নারও বিফল হয়ে হার মেনে অধোবদনে সরে এল ম্যাডাম স্প্যাগনোস-এর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে।

—আপনারা সবাই এখানে জঘন্য প্রবঞ্চক, গ্রীক ভদ্রমহিলা এবার পরম ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জে উঠলো, আমি আমার স্বামীকে জানাচ্ছি আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে। এলিওথেরিস জানে কিভাবে আপনার মত চোরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হয়। আপনি আমার প্রচুর অর্থ খেয়েছেন, পারিবর্তে আপনি ও আপনার ঐ ছোটলোক গুণ্ডা হাড়হাভাতে সহকারীরা আমায় একটুকু শান্তি দিতে পারেনি।

একজন পরিচারিকাকে ঘুষ দিয়ে মহিলা এথেন্স-এ তার স্বামীর কাছে তার পাঠালো। একথা বর্গ অবশ্য ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। পরবর্তী রবিবার সকালে দেখা গেল ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ি এসে প্রবেশ করল চ্যাটো ব্রিগুলিয়ার চত্বরে। তা থেকে নেমে এল গাট্টা-গোট্টা শক্ত মাংসপেশীওয়ালা বুলডগের মত মুখাকৃতি একজন ভদ্রলোক। যদিও পরনে ছিল তার খুবই অভিজাত ও মূল্যবান পোশাক, তবু জামার ফাঁকে, কলারের পাশ দিয়ে দীর্ঘ চুল বেরিয়ে থাকায়, তাকে মানুষের চেয়ে গরিলার মতই দেখাচ্ছিল সমধিক।

আগন্তুক এসেই বাজখাই কণ্ঠে বিদেশী টানে জানতে চাইল সংস্থার মালিক কে?

এই অদ্ভুত আকৃতির লোকটির সামনে একসময় এসে দাঁড়ালো প্রফেসর

বর্গ। কিঞ্চিৎ নার্ভাস অবস্থায় বললে, আমিই হলাম স্বত্বাধিকারী স্যার। আমার নাম বর্গ। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

—আমার নাম ইলিউথেরিয়স স্প্যাগনোস্। তুমি হলে একজন হতচ্ছাড়া জুয়াচোর। আমি এথেন্স থেকে চলে এসেছি আমার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। কিন্তু তার আগে প্রথমে আমি তোমায় এমন কিছু দিয়ে যেতে চাই যাতে আজীবন আমাকে তোমার স্মরণে থাকে।

এই বলে গ্রীক জাহাজ-মালিক তার ডান হাতের বজ্রমুষ্টি বর্গের নাকের কাছে হুঁশিয়ারী ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলো। আঙুলের গাঁটে গাঁটে তার তীক্ষ্ণধার সূচাগ্র পেতলের তৈরি বোতাম লাগানো। সেই শূকরের মত হাতটি প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানলো বর্গের গালে। হাতুড়ে বর্গ সে আঘাতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে তার মাথার পেছনে হাতুড়ির মত ক্রমাগত আঘাত করে গেল গ্রীক বণিক। এর পর আধা অজ্ঞান বর্গের দেহটাকে ফুটবলের মত ড্রিবল করতে থাকল সে।

তিনজন সহকারী প্রাণপণ চেষ্টা করে তবে হোরেস বর্গ-এর রক্তাপ্লুত দারুণ আহত দেহটাকে অগ্নিশর্মা দানব গ্রীক স্বামীর হাত থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হল।

স্প্যাগনোস্ সরাসরি স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লিনিক ত্যাগ করে চোখের আড়ালে চলে গেল।

উপরতলার এক গবাক্ষপথে জালি পর্দার আড়াল থেকে ডরোথী ওয়েনরাইট উঁকি মেরে সব কিছু প্রত্যক্ষ করল। দেখে শুনে সে যেন খুবই খুশী হল, আনন্দিত হল। ক্লিনিকের কর্মীরা যখন প্রফেসর বর্গের আঘাতস্থল ও রক্তাক্ত স্থানগুলিতে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছিল সে সময় ডরোথীর মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি, যার অর্থ হল বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল।

এই গুরুতর ও লজ্জাজনক প্রহারের ধকল থেকে সেরে উঠতে বর্গ-এর প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগলো। তবে সে দমে যাবার বাচ্চা নয়, সেরে উঠে ফের পূর্ণোদ্যমে পেশেন্টদের নিয়ে চিকিৎসা কর্মে লেগে গেল।

এর পর এল এক চরম সাফল্য। সাফল্য এল এক নতুন পেশেন্ট-রূপে। পেরু-দেশীয় প্রখ্যাত টিন ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকারিণী এই বিবাহিত মেয়েটির নাম ডলরেস সিমকো। বগ´ প্রমাণ করে দিল যে তরুণীটি আদৌ 'কামশীতল' নারী নয়, যা সে নিজে ও তার স্বামী ভেবে নিয়েছিল এতকাল।

একদিন যখন বগ´ গল্‌ফ খেলার নিকার-বোকার পরে, মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রণয় বিষয়ে আলোচনা করছিল, তখন দেখা গেল ডলরেস যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে এসে গেছে এক চাপা চঞ্চলতা, তার মুখাবয়ব রক্তাভ হয়ে উঠেছে লাজুক লাজুক ভাবে। চতুর বগে´র মনে চট করে এক সন্দেহ এল। সে ফ্রয়েডের শিষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে সাইকোঅ্যানালেসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেয়েটির গুপ্তকথা বের করে নিল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মেয়েটি সসংকোচে স্বীকার করল, যখন তার পনের বছর বয়েস, তখন তার পিতার গলফের পার্টনার এক ভদ্রলোক তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে তোলে নিকটবর্তী গ্রীন হাউসে। লোকটার পরনে ছিল তখন নিকারবোকার। সে দিনের সেই স্মৃতি কিশোরী মেয়েটির কাছে খুবই রোমাঞ্চকর, জীবনের প্রথম যৌনসংযোগের সুখ-স্মৃতি সে আজও ভোলেনি। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সে ঘটনাকে অবচেতনের গভীরে চাপা দিয়ে রেখেছিল এতকাল।

বগ´ এর পব নিজে ও সহকারীদের দিয়ে নিকারবোকার পোশাকে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রণয়ের বাস্তব অভিনয় করিয়ে চরম সাফল্য লাভ করেছে। অতঃপর সে মেয়েটির স্বামীর কাছে এক পত্রযোগে জানিয়েছে :

প্রিয় সেনর,

সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয় অনিবার্য কারণে, তবু বলছি আপনার স্ত্রী খুবই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী যৌবনবতী রসিকা এক মহিলা। প্রশ্ন করবেন না, আমার অনুরোধ, এর পর আপনি নাইট শার্টের পরিবর্তে নিকারবোকার পরিধান করে স্ত্রী মিলনে যাবেন

এবং দেখবেন আর কোন বাধা নেই বিপত্তি নেই, নেই কোন হতাশা, অচিরে স্বর্গীয় আনন্দে অবশ্যই বিভোর হয়ে যাবেন দুজনে।

স্বামী ছেলেটি বর্গে'র কথা রেখে অতীব সুফল পেয়ে এতই আনন্দিত হল যে অবিলম্বে হোরেস বর্গ'-এর নামে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপে ২০,০০০ ডলারের এক চেক লিখে পাঠিয়ে দিল। সে বিপুল অর্থ পেয়ে বর্গ' এর চেয়েও বড় এক প্রাসাদে তুলে নিয়ে গেল তার ক্লিনিক।

কিন্তু নেভবার আগেই বুঝি প্রদীপ শিখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই বৃত্তান্ত।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। প্রফেসর বর্গ' তার সুযোগ্য সহকারী তিনজনকে ডেকে সংগোপনে জানালো ডরোথী ওয়েনরাইট-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

—জানো এই স্ত্রীলোকটি একাধারে ভয়াবহ এবং অসহ্য। এক সময় ও আমার কাছে প্রয়োজনীয় ছিল ঠিকই। কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমশঃ এ মহিলা তার বিদিকিচ্ছিরি ঈর্ষাপরায়ণ মনের দ্বারা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। জানো, কত বড় আস্পর্ধা, ও আমার পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, আমার চিঠিপত্র খুলে পড়ছে, ক্লিনিকের সমস্ত মহিলা পেশেন্টদের অযথা অপমান করে চলেছে। ডরোথী আমেরিকা ফিরে যেতে নারাজ, পরিবর্তে আমার ঘাড়ে বসে আমার জীবনকে সে অতিষ্ঠ করে তোলবার পণ করেছে।

—প্রফেসার, আমাদের কি করতে বলেন ওকে নিয়ে?

—বলছি শোন। মার্সেলিস বন্দরে এস. এস. ট্রিয়েস্তি নামে একটি ৭০০০ টনের ছোট জাহাজ নোঙর করা আছে। তার ক্যাপ্টেন আমার জানাশোনা লোক। ৫ই নভেম্বর সে জাহাজ রিও ডি জেনেরো যাত্রা করবে কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করে। আমি স্কিপারকে অর্থ দিয়ে রাজী করিয়েছি এই অনিচ্ছুক মহিলা ডরোথীকে যাত্রীরূপে সে জাহাজে নিতে। ব্রেজিলে স্কিপার সহজেই ডরোথীকে

যে কোন গণিকালয়ের মালিকের কাছে বেচে দিতে পারবে ভাল অর্থের বিনিময়ে।

এই বলে বর্গ তার অভিনব পরিকল্পনার কথা ওদের বুঝিয়ে বলল, কিভাবে ডরোথীকে স্মাগল্ করে নিয়ে জাহাজে তোলা হবে। তারপর সে বন্দিনী অবস্থায় কিভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় পাচার হয়ে বন্দরস্থ গণিকা ব'নে গিয়ে দেশবিদেশের নাবিকদের মনোরঞ্জন করে ইহজীবন কাটাতে বাধ্য হবে।

নভেম্বরের তিন তারিখে বর্গ ও ডরোথী মার্সেলিস বন্দরে পৌঁছে হোটেল ভিক্টর হুগোতে স্বামী-স্ত্রীরূপে নাম লিখিয়ে উঠল। ডরোথীকে বর্গ বলেছে জাহাজের এক ব্যবসায়ে কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে সে তাকে এই বন্দর নগরে এনেছে, এ ব্যাপারে তার পরামর্শও সে চায়। খুশী করবার জন্য বর্গ মহিলাটিকে একটা নীল রঙের কোট কিনে দিল।

সে রাতে বর্গে'র দিক থেকে প্রণয় সোহাগ যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমই হল। এক সময় ক্লান্ত ডরোথী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। বর্গে'র চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ত্রস্তে সে উঠে ক্লোরোফর্ম ভেজানো একটি রুমাল চেপে ধরলো ডরোথীর নাকে। প্রথমটা প্রবল ঝটাপটি করলেও শেষে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। বর্গ এবার উঠে গিয়ে খিড়কির জানলাপথে রাস্তায় দাঁড়ানো দুজন সহকারীকে টর্চ জ্বেলে ইশারা করল।

মিনিটখানেক বাদে ফায়ার এস্কেপ দিয়ে দুজন লোক সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল। ওলন্দাজ লুবে রাস্তায় রইল পাহারায়, যদি কোন জেন্ডারমে (পুলিস) বা হোটেল কর্মী সামনে এসে যায় তো সে পূর্বাহ্নেই হুঁশিয়ারী করে দেবে। ফরাসী ও ইংরেজ দুইজন অচৈতন্য ডরোথীকে একটা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে যে পথে এসেছিল সে পথে নেমে গিয়ে দণ্ডায়মান একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল।

স্বস্তির প্রবল নিশ্বাস বেরিয়ে এল বর্গ'-এর বুক থেকে। উঃ কি

শান্তি, বাঁচা গেল। নচ্ছার মেয়েমানুষটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল অবশেষে। হোটেল ঘরের সমস্ত জানলা খুলে দিল সে। ঘর থেকে ক্লোরোফর্মের গন্ধ যাতে চলে যায়। তারপর আরাম করে দেহ এলিয়ে দিল দুগ্ধফেননিভ বিছানায়। সে নতুন নতুন মহিলা রোগীর আগমন, অজস্র অর্থোপার্জন প্রভৃতির সুখচিন্তায় বিভোর হয়ে গেল। যাক ঐ পথের কাঁটা ডরোথীটাকে তো সরানো গেছে, আপদ চুকেছে এবার প্রাণভরে স্ফূর্তি করা যাবে।

চোখে বুঝি তন্দ্রা নেমেছিল। শেষ রাত প্রায় পাঁচটা। বর্গের তন্দ্রা সহসা ভেঙে গেল। আধা নিদ্রা আধা জাগরণে মনে হল যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ঘরে। কে যেন ঘরে এসে ঢুকেছে।

—কে !! বর্গ ভাবলো সহকারীরা বোধ হয় ফিরে এসেছে এই সংবাদ নিয়ে যে ডরোথীকে তারা বন্দিনী অবস্থায় ট্রিয়েস্টি জাহাজের কেবিনে তালা বন্ধ অবস্থায় রেখে এসেছে।

এমন সময় গলার মাঝখানে তীক্ষ্ণ একটা ধাতব ছোঁয়াচ লাগতেই বর্গ সম্পূর্ণ জেগে গেল। নিদারুণ আতঙ্কে তার জিভ শুকিয়ে গেল। শেষ রাতের আবছা আলোয় দেখলো একটা মানবমূর্তি তার ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে। চোখ থিতোতে দেখলো সেই ছায়ামূর্তির অঙ্গে নীল রঙের একটা কোট। এ তো মানব নয়, এ যে এক মানবী। স্ত্রীলোকটি হাতের ছুরিটাকে আরো একটু চাপ দিতে মৃত্যুভয়ে দিশেহারা বর্গ মাথাটাকে আরেকটুকু ঠেলে তোশকের মধ্যে পেছন দিকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

সর্বনাশ ! বর্গের এবার নজরে পড়লো, এ যে আর কেউ নয়, এ যে স্বয়ং ডরোথী ওয়েনরাইট !! অ্যাঁ...তুমি !!

—আমার কয়েক বছর আগে তোমাকে হত্যা করা উচিত ছিল, ভয়াবহ কণ্ঠে ডরোথী হিসহিস করে বলে ওঠে, ঐ নির্বোধ গুণ্ডাগুলি আমাকে ভুল :এক জাহাজে নিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ফেলে এসেছিল। ক্যাপ্টেন জেণ্ডারমেস (পুলিস) ডাকে আর তারাই আমাকে এ হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এখন আমি দেখতে চাই তুমি মর,

বুঝলে শয়তান হোরেস।

এর পর বর্গ বৃথাই প্রাণভিক্ষার জন্য করুণভাবে আকুলিবিকুলি করল কিন্তু তার কথাগুলি ভালভাবে বোঝা গেল না, কারণ তখন তীক্ষ্ণধার ছুরিকাটি তার কণ্ঠের তাজা রক্তপান করতে শুরু করেছে। অবশেষে পুরুষটির বিরক্তিকর আর্তস্বরে ক্লান্ত হয়ে ডরোথী ছুরিকাটিকে সমূলে ঢুকিয়ে দিল বর্গের গলায়। ছুরি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বালিশে গিয়ে বিঁধলো। ফিনকি-দেওয়া রক্তে বালিশ বিছানা লাল হয়ে গেল।

সকাল আটটার সময় হোটেল পরিচারিকা এসে দেখলো মৃত হোরেস বর্গের পাশে রক্তাক্ত বিছানায় এক ভদ্রমহিলা শুয়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিল বিছানার চাদরটা বুঝি লাল রঙে ছোপানো, পরে যখন বুঝলো ওটা রক্ত তখন সে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠল।...

ডরোথী অতি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে,এই নির্বোধ মেয়েটা, অমন করে চেঁচাবার কি আছে? এটা একটা মৃত ব্যক্তি। হোরেস কামশীতল মেয়েদের চিকিৎসা করছিল...এবং তাতে বেশ আনন্দ-লাভই করছিল কয়েক বছর ধরে। এখন সে নিজেই পরিপূর্ণ শীতল-কাম বনে গেছে আর আমি এখন খুবই আনন্দ লাভ করছি।

বলে হোহো করে বিকট এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো প্রতি-হিংসাপরায়ণা একদা চরম লালসাময়ী নারী ডরোথী ওয়েনরাইট।

দেখে শুনে ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল পরিচারিকা সেই মৃতের ঘর থেকে।

ধুধু করছে বরফের রাজ্য। যত দূর দৃষ্টি চলে চোখ ঝলসানো শ্বেতশুভ্র নদী, বরফ, তুষারময় মেরু অঞ্চল। দুজন শ্বেতকায় ব্যক্তি তাদের স্নো-গ্লাসের ফাঁকে দুমাইল দূরে অবস্থিত এস্কিমোদের গ্রামের দিকে তাকিয়েছিল। দূর থেকে এস্কিমোদের নর নারী শিশু ও কুকুর-গুলিকে চলমান বিন্দু বিন্দু প্রাণীর মত মনে হচ্ছিল।

বয়স্ক ব্যক্তিটির নাম লুই প্যারিস, জাতে ফরাসী কিন্তু এ রাজ্যে আছে বিশ বছর। চোখ মুখ আকৃতি দেখলে বোঝা যায় মানুষটা সাংঘাতিক মদ্যপায়ী। তার সঙ্গীটি যুবা পুরুষ, দীর্ঘাঙ্গ, পেশীবহুল দেহ, একমুখ রক্তলাল দাড়ি এবং চুলের রঙও লাল।

প্যারিস বললে, ব্রাদার তোমার ঐ লাল দাড়ি কিন্তু এ অঞ্চলে 'ষাঁড়ের সামনে রক্তপতাকার' মত ভয়াবহ। এই সব অসভ্য আদিম এস্কিমো মানুষেরা লাল চুলকে সাংঘাতিক ভয়ের চোখে দেখে।

বলে পকেট থেকে বোতল বের করে ঢক ঢক করে কিঞ্চিৎ মদ খেয়ে নিল সে। অসহনীয় শৈত্য, শূন্যের চেয়েও ১০ ডিগ্রী নিচে তাপাঙ্ক।

—দাড়িটা কামিয়ে ফেলো ব্রাদার। তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। প্যারিস ফের বলে।

যুবকের নাম আইক ব্রিজেস। সে হেসে বললো, দাড়ি কামালেও আমার মাথার লাল চুলের কি হবে? ওদের কুসংস্কারের জন্য কি আমার মাথাও কামিয়ে ফেলতে হবে?

প্যারিস বললে, তোমার মাথার চুল হল তোমার প্রাণ। শোন, এই এস্কিমোদের একজন দুষ্ট আত্মার নাম হল ইয়াকক্। ওদের জাদু ডাক্তারের মতে সেই প্রেতাত্মার চুল নাকি লাল। যে রাতে জোর বাতাস বয় সে রাতে নাকি ঐ ইয়াকক ওদের নারীদের সন্তানদান করে থাকে। দেখো বাবা তুমিও আবার ইয়াককের মত এস্কিমো

মহিলাদের গর্ভবতী করে তুলো না যেন।

বলে নিজ রসিকতায় উচ্চস্বরে হেসে উঠল প্যারিস।

—হাট্ হাট্ চল্, বলে এবার প্যারিস তার স্লেজ-এ বাঁধা কুকুর-গুলোকে তাড়া দিল। কুকুরেরা স্লেজ নিয়ে চলতে শুরু করলো ঐ দুমাইল দূরের বরফে আচ্ছন্ন গ্রামের দিকে।

ছাব্বিশ বছরের তাজা তরুণ জোয়ান ছেলে আইক গত শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকার একজন নামকরা হেভিওয়েট বক্সার ছিল। এখন আইক চলেছে সেজবক নামক এস্কিমো উপনিবেশে ফার-এর ব্যবসা করতে। ফরাসী ভদ্রলোক এখানকার পুরনো ব্যবসাদার, সেই ওকে নিয়ে চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্যে ওকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সময়টা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

যুবক মানুষ আইক এই সব এস্কিমো মেয়েদের সম্পর্কে নানা ধরনের লোভনীয়, রহস্যজনক ও মজাদার কাহিনী ইতিপূর্বে দূর থেকে শুনে এসেছে। প্রশ্ন করল।

--আচ্ছা, লুই, এদের মেয়েরা কিরকম বল তো ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্যারিস সঙ্গীর পানে বারেক তাকিয়ে বললে, ওদের মেয়েদের দিকে নজর দেবার চেষ্টা কর না বৎস, তাহলে তোমার পিঠের চামড়া আস্ত থাকবে না। অবশ্য তুমি রমণীমোহন হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। তোমাকে ইয়াকক জ্ঞানে ছাড়পোকার মত তোমার সান্নিধ্যে লেপটে থাকবার চেষ্টা করবে মেয়েগুলি। কিন্তু ব্রাদার ওদের পুরুষরাই হবে...মানে, ঝামেলা বিশেষ...নাঃ তোমাকে এখানে আনা আমার দেখছি উচিত হয়নি। উঃ ঐ রক্তবর্ণ চুল দাড়ি তোমার কখন যে কি ভয়ংকর কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসে তাই আশঙ্কা করছি।

স্লেজ চলেছে কুকুরদের টানে। পাশে পাশে দ্রুত গতিতে চলছে দুজন মানুষ অকল্পনীয় ঠাণ্ডায়। আধঘণ্টার মধ্যেই ওরা বরফ ভেঙে এসে উপস্থিত হল এস্কিমোদের সেই গ্রামে। প্যারিস স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কুসককউইম নামক এস্কিমো ভাষায় কুশল আদান প্রদান করল। মেয়েগুলি কলকলিয়ে উঠল দুর্বোধ্য ভাষায় আর

পুরুষেরা তাদের পরিচিত পুরনো ফার ব্যবসায়ী বিদেশী মানুষ বন্ধু-বিশেষ প্যারিসকে হাত তুলে স্বাগত জানালো।

কিন্তু আইকের দিকে নজর পড়তেই তাদের চোখ মুহূর্তে জ্বলে উঠল হিংসাশ্রয়ী হয়ে। ওর লাল দাড়ি দেখে ঘৃণায় তাদের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ কি সব কথা শুরু হয়ে গেল তাদের।

একজন দৈত্যকায় এস্কিমো তো ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে এসে ওর দিকে পা-ই চালিয়ে দিল। আঘাত পেয়ে ক্রুদ্ধ আইক বজ্র মুষ্টি ডান হাতটি তুলতেই প্যারিস পলকে ধরে ফেলে ওকে নিরস্ত করল। মিনতিভরা কণ্ঠে বলে উঠল, না না ব্রাদার এভাবে এদের মাঝখানে বসবাস শুরু করা উচিত হবে না। ওরা কিন্তু তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। এ লোকটা হল এখানকার পুরোহিত ও ডাইনী ডাক্তারের (অ্যাংগকক) ছেলে, সেগলুক। বাপের দৌলতে খুবই শক্তিশালী নামডাকের মানুষ এ। দাঁড়াও তোমার হয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলি।

কুসককউইম ভাষায় প্যারিস কি যেন সব বলল। তারপর পকেট থেকে একটা আনকোরা পাইপ বের করে এস্কিমোটার হাতে দিয়ে বললে, তোমার জন্যে এনেছি এটা বন্ধু সেগলুক। এই নাও তামাকও। এটি আমার বন্ধু গুডা ব্রিজেস। এ আমার মতই একজন শ্বেতাঙ্গ গুডা। ওর লাল চুলটা সহজাত একটা দুঃখের ব্যাপার, মানে ওতে তো ওর হাত ছিল না, বুঝলে তো ?

—না, ও অবশ্যই ইয়াকক। ও আমাদের মেয়েদের সঙ্গে শোবে আর আমাদের ক্যারিবুদের (বলগা হরিণ) তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এস্কিমোদের মধ্যে ক্রুদ্ধ কোলাহল শুরু হয়ে গেল। অবিশ্বাস ও ক্রোধ ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠলো। প্যারিস দেখে শুনে ভয়ে ঘামতে লাগলো। কয়েকজন তাদের ওয়ালরাস (সিন্ধুঘোটক জাতীয় জলজ প্রাণী-বিশেষ) কাটা ছুরি বের করলো আক্রমণের উদ্দেশ্যে।

সহসা প্যারিসের নজর পড়লো ইগলুর ছোট্ট বৃত্তাকার দরজা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে কুঞ্চিতচর্ম বৃদ্ধ ডাকিনী ডাক্তার বেরিয়ে আসছে।

হ্যালো টিগেক, প্যারিস সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে এগিয়ে যায়, হে বন্ধু, হে পুরোহিত আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল তো ? এই দেখুন আপনার জন্য কি উপহার এনেছি, বলে সে নস্য ভর্তি একটা বড় টিন বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললে, দয়া করে আপনার ছেলেকে নিরস্ত করুন। আমার বন্ধু গুডা ব্রিজেস কিন্তু দুষ্ট আত্মা ইয়াকক আদৌ নয়। একথা ওকে বুঝিয়ে বলুন। আমি চাই না এখানে একটা লড়ালড়ি হোক। আমরা এখানে সবাই বন্ধুভাবেই থাকতে চাই।

ডাকিনী ডাক্তার দেখতে ছোটখাটো মানুষ হলেও তার ব্যক্তিত্ব ও দাপট দুর্দমনীয়। ডাক্তার রোজা হিসেবে বিশেষ ধরনের শিরস্ত্রাণ ও পোশাক তার, কণ্ঠে ঝুলছে নেকড়ের দাঁতের মালা। ছেলেকে কি বলতেই সে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে অধোবদনে সরে গেল সেখান থেকে।

পুরোহিত এবার প্যারিসকে বললে, অনেক চান্দ্রদিন তুমি বাইরে ছিলে। তুমি ফিরে এসেছ, আমি আনন্দিত। আজ রাত্রে আমাদের ন্‌গো-ন্‌গাই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তোমার লাল দড়িওয়ালা বন্ধু তার নিজের মঙ্গলের জন্যই এ অনুষ্ঠান থেকে যেন দূরে থাকে। মানে সে যেন তোমার কাঠের ঘরেই আবদ্ধ থাকে। তোমার মত পুরনো বন্ধু গুডাই একমাত্র এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবে।

প্যারিসের মুখে একথা শুনে, আইক ইংরিজিতে বলে ওঠে চুলোয় যাক রোজা ব্যাটার হুঁশিয়ারী। আমি দেখবই ওদের ঐ ন্‌গো-ন্‌গাই উৎসব। বলো ওদের একথা। এখন থেকেই আমার ওপর খবরদারী করতে দিলে আমার ভবিষ্যতের দফারফা হয়ে যাবে। তখন আমি ওদের সঙ্গে ফার-এর ব্যবসা করতে আর পারবই না। ব্যাটারা আস্কারা পেয়ে যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যারিস একটা নতুন বোতলের ছিপি খুলে বললে, তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। ঠিকই বলেছ তুমি। এক হয় ওরা নয় তো আমরা প্রভুত্ব করবে বা করব। এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আর কখনো আমাকে হতে হয়নি। ইস্‌ যদি

তোমার দাড়িটা লাল না হত।

সন্ধের আগে আইক পর পর ইগলুগুলির পাশ দিয়ে খুব ডাঁট-এর মাথায় হেঁটে যেতে লাগলো। আড়চোখে সে দেখলো প্রতিটি ইগলু থেকে যুবতী এস্কিমো মেয়েরা ওর পানে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে একটা মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে শরীরের অর্ধেক বের করে অস্ফুটে বলে উঠলো, এই চীমো...চীমো...চলে এস ভেতরে!

আইক নীচু হয়ে ভালভাবে দেখলো মেয়েটাকে। মাথার কিম্ভূতকিমাকার এক বিশ্রী তেলের গন্ধ নাকে এল তার। মোটা চাদরের চামড়ার পোশাকে মেয়েটার দেহের আকৃতি বর্তুলাকার ধারণ করেছে। সহসা পেছন থেকে আরও তিনটে মেয়ে এমন ধাক্কা দিল ওকে যে আইক হুমড়ি খেয়ে পড়ে ইগলুর নীচু ও ছোট্ট দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করল। বাইরের কনকনে আবহাওয়ার তুলনায় ভেতরটা আশ্চর্যরকম উষ্ণ। একটা মাটির পাত্রে সীল মাছের চর্বি দিয়ে আলো জ্বালা হয়েছে, তাতে ঘর আলোকিত করেছে আর উত্তাপও দিচ্ছে বেশ।

মেয়েটি ওর পানে তাকিয়ে বললে, আমার নাম হল সারাভোক, আমার আহার খুব কম। আমি তোমার ফাঁদ পাততে পারব, ছেঁড়া জাল সেলাই করে দেব। এই নাও গুডা পোশাক ছেড়ে এটা পর।—বলে এতটুকু সঙ্কোচ না করে হরিণের চামড়ার তৈরী একটা পেণ্টালুন এগিয়ে দিল ওর দিকে।

আইক ইতিপূর্বে এমন কিছু নিষ্পাপ জীবনযাপন করে নি দেশে। একাধিক নারীই এসেছে তার জীবনে, অধিকাংশই শয্যাসঙ্গিনী হয়ে। কিন্তু আজকের মত এতটা সঙ্কোচবোধ করে নি কখনো। তিনটি মেয়েও ওর পেছন পেছন ইগলুতে ঢুকেছিল। তারা এখন এক জায়গায়, সকৌতূহল নয়নে 'এবার কি কাণ্ড হয়ে দেখি' গোছের ভাব নিয়ে বসে পড়েছে।

—এই বিমেবাইটা খেয়ে নাও, তারপর শোবার বিছানা দেখিয়ে দেব, বললে সারাভোক।

মেয়েটার বাইরের স্থূলকায় পোশাক খোলবার পর দেখা গেল চেহারাপত্র মন্দ নয়। লোভনীয়ও বটে, বিশেষ করে আলাস্কা ছেড়ে আসবার পর যে মানুষের বহু দিনই কেটেছে নারীবিহীন জীবন তার পক্ষে।

আইক বিমেবাই নামক খাদ্য বস্তুটি পাত্রসহ তুলে ধরে গন্ধ নিতে তার নাড়ীভুঁড়ি উলটে আসার দাখিল হল। শোনা গেল এই সুখাদ্যটি হচ্ছে তিমির চর্বির সঙ্গে ঘেটিয়ে দেওয়া সীল মৎস্যের রক্ত। সে ওালেয়াক নাম্নী একটি মেয়েকে তা দিয়ে দিল। সে চেটেপুটে তাদের উপাদেয় খাদ্যটি খেয়ে নিল।

ইগলুর চারদিকে বিচিত্র সব বস্তু। মেয়ে তিনটি মিটিমিটি হাসি সহকারে কিচিরমিচির করছে আর আইকের মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে খুব একটা মুখরোচক কিছু ঘটনের অপেক্ষায়। আইক তার লাল চুলদাড়ি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

সহসা ইগলুর এক অন্ধকার কোণে নজর পড়তে আইক চমকে উঠলো। সারাভোক নাম্নী মেয়েটা ইতিমধ্যে সমস্ত দেহ থেকে তার যাবতীয় পোশাক খুলে ফেলে দিয়েছে। সারা অঙ্গে গ্রীজ্-এর মত কি যেন মাখানো। দেহের বাঁধুনিতে এই ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মেয়েকে মনে হয় যেন ষোল সতের বছরের উদ্ভিন্ন যৌবনা।

মেয়েটার অশোভন আকার ইঙ্গিতে একটি জিনিসই বোঝায়। আইকের রক্তে তপ্ত দোলানী শুরু হল। সেই অস্বস্তিকর অবস্থাকে চাপতে সে পেছন ফিরে তিনটি মেয়েকে সচিৎকারে ধমকে উঠল, কী হাঁ করে দেখছো কি। যাও বেরিয়ে যাও ইগলু থেকে। এটা কি সিনেমা না সার্কাস গেট আউট, কুইক্।

হাসতে হাসতে মেয়েগুলি ওদের দুজনকে রেখে ইগলু থেকে বেরিয়ে গেল। আইক ভেতরকার হারপুন, কুড়োল, জাল এবং বিরাটকায় তিমির হাড়ের একটা টুকরো দেখলো টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে।

—আমার স্বামীর অস্ত্রশস্ত্র এগুলো, সারাভোক গর্ব করে বলে

ওঠে, আমার স্বামী খুব ভাল শিকারী, বহু প্রাণী বধ করে সে। মাছ ধরে প্রচুর, তার দ্বারা আমাদের খাওয়া-পরার থাকার খুব ভাল ব্যবস্থাই সে করে। খুব শক্তিশালী পালোয়ান মানুষ আমার স্বামী।

অ্যাঁ—আইকের উদ্যম সব নিভে গেল। মেয়েটা বিবাহিতা তার উপর স্বামী পালোয়ান এবং নামকরা শিকারী। সর্বনাশ। এমনিতেই গ্রামের কিছুলোক চটে গেছে, তার উপর আরেকজন শক্তিশালী মানুষকে শত্রু করে তোলা...রক্ষে কারো।

আইক ইগলুর দরজার দিকে পালাতে গিয়ে দেখলো সেখানে উঁকি দিয়ে আছে একটি পুরুষের মুখ। অবশ্য সে মুখ বন্ধু প্যারিসের।

—এখন তোমার পালানো চলবে না সখা, প্যারিস ফিসফিসিয়ে বলে, একজন শ্বেতাঙ্গ গুডাকে দেহদান করা একটা মহৎ কর্ম বলে এখানকার মেয়েরা মনে করে। এর স্বামীও তাই মনে করে। এই এস্কিমোদের অদ্ভুত আতিথেয়তা হল স্ত্রীকে অতিথির অঙ্কে তুলে দেওয়া। এটা এরা খুব সম্মানের বলে মনে করে। তুমি যদি মেয়েটাকে বিমুখ করে ফিরে যাও তো তা সারা গাঁয়ের লোক জেনে ফেলবে। মেয়েটির পক্ষেও সেটা হবে নিদারুণ মানহানিকর ব্যাপার। তারা মেয়েটিকে ভাববে কুৎসিত, যমের অখাদ্য বিশেষ। ওর স্বামী ডিজিলিক যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। ফলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যেতে পারে। অতএব বন্ধু আমাকে বাঁচাও এবং তরুণীটিকে তৃপ্ত করো বৎস। এদেশীয়দের কাছে এ ব্যাপারটা আমাদের করমর্দনের মতই সহজ সরল অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার।

প্যারিস এই বলে নিষ্ক্রান্ত হল। আইক ফিরে গেল বিবস্ত্রা সেই এস্কিমো যুবতীর দিকে। ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে চুম্বনটা মেয়েটার কাছে এক আজব অভিজ্ঞতা বুঝি। কামনালুব্ধ নারীদেহকে সজোরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আইক দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী এক চুম্বনে প্রায় দিশেহারা করে ফেললো এস্কিমো তরুণীকে।

—ঐ যে নেকড়ের চীৎকার শোনা যাচ্ছে বাইরে। নিশ্চয়ই রাত্রি

হয়েছে। এখনই সময় হল ন্‌গো-ন্‌গাই উৎসবের। তুমিও আসছ তো শুডা?

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হ্যারিসন বুলার্ড-এর 'এস্কিমোজ প্রিমিটিভ অ্যাণ্ড দেয়ার কাস্টমস্‌' গ্রন্থে এই ন্‌গো-ন্‌গাই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

এটি একটি গুপ্ত অনুষ্ঠান, স্বীকৃতির অনুষ্ঠান। শয়তান পূজা হয়, এখানে জড়ো হয় পরিত্যক্তা, ভ্রষ্টা মেয়েরা, এখনে সন্তানসম্ভবের জন্য বিচিত্র প্রার্থনা হয়, নৃত্যরতা মেয়েরা নিজেদের পাপাচারের কথা অকুণ্ঠে স্বীকার করে শাস্তি গ্রহণ করে। সামান্য চুরি থেকে শিশুহত্যা, ব্যাভিচার প্রভৃতি যাবতীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি হয় এ অনুষ্ঠানে।

চারদিকে বরফ জমে যাওয়া ভুঁয়ে বসে থাকে পুরুষেরা। ওয়ালরাস-এর চামড়ায় তৈরী মাদল বা ড্রাম বাজাতে থাকে তারা। মেয়েরা নাচতে নাচতে ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের পাপাচারের স্বীকারোক্তি করতে থাকে। সব মেয়েরই বয়েস তিরিশের নীচে। মাদলে গুঞ্জন মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান স্থল। নাচতে নাচতে মেয়েরা তাদের অসনবসন খুলে ফেলতে থাকে একে একে, তারপর দাঁতে দাঁত লাগা হুহু কঁপুনির মধ্যে বলে যায় তাদের গুপ্ত কীর্তিকাহিনী। একপাশে জ্বলতে থাকে দাউদাউ আগুনের এক কুণ্ড।

বেশ দূরত্ব রেখে আইক দাঁড়িয়ে দেখছিল উৎসব। প্যারিস নার্ভাসভাবে বসে বসে বোতল থেকে মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিল।

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ইগলু থেকে। তার সারা অঙ্গে পাইন-পাতা ও তিমির টুকরো হাড় ঝোলানো। মুখটি খুবই সুন্দর কিন্তু ভীতি-বিষণ্ণ।

—এই মেয়েটি হল নিভারশ্যাক মানে কুমারী মেয়ে, প্যারিস ফিসফিসিয়ে আইককে বলে, এর বয়সে আঠারোর নীচে। অল্পবয়সী

সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে দিয়েই এরা অনুষ্ঠান শুরু করে। চুপচাপ শুনে যাও দেখে যাও ব্রাদার।

কিশোরী মেয়েটি নাচতে লাগলো। মাদলের বাজনার সঙ্গে দ্রুততালে নাচের গতিবেগ বেড়ে চললো। এমন সময় তীক্ষ্ণ এক নারী-কণ্ঠের আর্তচিৎকার শোনা গেল দর্শকদের মধ্যে।

মেয়েটির মা কেঁদে উঠলো, প্যারিস বললে, অভাগিনী জানে যে এর পর ওর কিশোরী কন্যার কি ভয়াবহ পরিণতি হতে চলেছে।

কিশোরী উন্মত্তের মত নেচে চলেছে। মায়ের আর্তনাদ ক্রন্দন ভেসে আসছে দর্শকদের মধ্য থেকে। কিশোরী এবার তার চামড়ার এবং ফারের দেহাবরণ খুলে ফেললো। মেয়েটির দুগাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে অবিরল ধারায়।

মাদলের বাজনা কমে এল। মেয়েটি মন্ত্রমুগ্ধার মত নাচতে নাচতে বলে গেল তার স্বীকারোক্তি কাহিনী।

গতবার যখন ন্যাসকোপি রেড ইণ্ডিয়ান দল এখানে এসেছিল সে সময় এই কিশোরী বালিকা ১৯ বছর বয়স্ক আগন্তুক এক ইণ্ডিয়ান যুবকের প্রেমে পড়ে। দুবার যুবকটির সঙ্গে মেয়েটির দৈহিক সংসর্গ হয়। এরপর এস্কিমোরা সেই অলস ও নিষ্কর্মা দলটিকে এ দেশ থেকে সহসা তাড়িয়ে দেবার ফলে প্রণয়ী যুবকটিও চলে যায়। কিশোরী বালিকা বিরহের দহনে দগ্ধ হতে থাকে। অতঃপর আসে তার দারুণ মনস্তাপ, অনুতপ্ত ভাব।

কোন ইণ্ডিয়ানকে দেহ দান করা এমনিতেই অনুচিত কর্ম। তার উপর ঐ ঘৃণ্য ন্যাসকোপি দলের কাউকে ভালবাসা তো অমার্জনীয় অপরাধ।

মেয়েটির মা-ই নুগো-নুগাইতে কন্যার স্বীকারোক্তির ব্যবস্থা করে। কিশোরী কন্যা এখন সর্দারদের শাস্তিবিধানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো কম্পিত দেহে, প্রায় নিরাবরণ শরীরে। বৃদ্ধেরা রোজা টাই-গেকের সঙ্গে দ্রুত কি সব পরামর্শ করে নিল।

অ্যাংগকক তার প্রস্তরীভূত তুষারাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চার-

দিকে গুঞ্জনরত দর্শকদের হাত তুলে থামিয়ে দিল। অতঃপর বিচ্ছিরি কণ্ঠস্বরে বলে গেল :

—এই কুমারী বালিকা মহাপাপ করেছে। ওকে আগামীকাল শ্যেন পক্ষীদের পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ও ভালভাবেই জানে ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে শোওয়ার শাস্তি কি।

লুই প্যারিস হাত ধরে আইককে কাছে এনে ফিসফিসিয়ে এই দণ্ডবিধানের বিস্তৃত বিবরণ দিল। মেয়েটাকে স্লেজে চাপিয়ে সেই ৯০০ ফুট উচ্চ পাহাড়টার ওপরে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্রাম থেকে ওটা প্রায় আট মাইল দূরে। ওখানে সর্বোচ্চ চূড়ায় মেয়েটাকে নিয়ে একটা টিলা থেকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কালান্তক সব শ্যেনপাখীর দল উড়ে এসে তাদের বীভৎস চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে উপড়ে নেবে ওর চোখ, গালের, মুখের, নাকের মাংস। তারপর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে ওর কণ্ঠনালী ও দেহের অপরাপর অংশ।

—আমি ইতিপূর্বে একবার এই ভয়ংকর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম —বলতে বলতে বিতৃষ্ণায় প্যারিস ঢকঢক করে বোতল থেকে অনেকটা মদ নির্জলা খেয়ে নিল, উঃ কী সাংঘাতিক সে রোমহর্ষক দৃশ্য, দেখা যায় না। কিন্তু জানো, কিছুই করবার নেই এর প্রতিকার, এটা ওদের সামাজিক আইন. এ শাস্তিবিধানও ওদের সাধারণ জীবন-যাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আরও কয়েকটা স্বীকরোক্তি ও শাস্তিদান হল। একটি বিবাহিতা মেয়ে নাচতে নাচতে জানালো যে সে স্বামীকে সর্বদা জ্বালাতন করে, খিটখিট করে। তার শাস্তি হল পায়ের তলায় গরম প্রস্তরের ছ্যাকা লাগানো। আরেকটি বিধবা স্ত্রীলোক নাচতে নাচতে স্বীকার করলো, তার স্বামী যখন সমুদ্রে ডুবে মারা গেল তখন সে খুবই আহ্লাদিত হয়েছিল।

—তুমি মৃত স্বামীর সম্বন্ধে বিরূপভাব পোষণ করেছ মনে, এটা মহাপাপ। রোজা গম্ভীর কণ্ঠে রায়দান করল, আমাদের কুকুরগুলোকে তুমি তিন মাস ধরে খাওয়াবে। কুকুরদের খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে

তা-ই আহার করে তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে রোজার পুত্র সেগলুক অদূরে উপস্থিত থাকা আইককে দেখে দারুণ ক্রোধে নিজ ছুরি বের করে পিতার অনুমতি চাইল আক্রমণ করবার।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে ছেলেকে থামিয়ে বললেন, না, ওকে কিছু করা করা চলবে না। আমি নতুন শ্বেতাঙ্গকে নিরাপদ থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমাদের পুরনো বন্ধু প্যারিসকে।

সে রাতে ঘুম হল না আইকের। একি অন্যায়। একটা ফুলের মত মেয়েকে বীভৎসভাবে এইভাবে হত্যা করা। প্রচুর মদ্যপান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে প্যারিস। আইক চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকলো যতক্ষণ না মেয়েটিকে নিয়ে এস্কিমোরা সেই কালান্তক শ্যেনপক্ষী পাহাড়ে রওনা দেয়।

জানলা পথে চেয়ে দেখলো চূর্ণ তুষারে ধোঁয়াটে করে ওদের স্লেজ এগিয়ে চলেছে বধ্য পাহাড়ে। এস্কিমোরা অদৃশ্য হয়ে যেতে আইক বন্ধু প্যারিসের স্লেজ নিয়ে অনুসরণ করল ওদের। কি করবে বা করতে পারবে জানে না সে। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে, এটাই হল উথালপাথাল যন্ত্রণাদায়ক মনোবাসনা তার।

দেখা গেল এস্কিমোরা ফিরে আসছে। ত্রস্তে আইক একটা বরফ চাঁইএর পেছনে স্লেজ নিয়ে লুকিয়ে পড়ল। ওরা চলে গেলে সে বেরিয়ে এসে, হাতে দড়ি ও কুড়ুল নিয়ে হেঁটে চললো বধ্য পাহাড়ের দিকে। খুব সাবধানে রুক্ষ পায়ে চলা পথ ধরে দুরারোহ শীর্ষে উঠে গেল আইক।

নজরে পড়ল কর্ণবিদারী চীৎকার করে বাজপাখিগুলি চতুর্দিকে উড়ছে। সহসা এবার নজরে পড়লো একটা মস্ত পাহাড়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে মেয়েটিকে বেশ নীচে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। নিমেষে একটা বাজপাখি পাখা ঝাপটে মেয়েটার মুখের ওপর আক্রমণ করে পালিয়ে গেল। শোনা গেল মেয়েটির বুকফাটা আর্তনাদ ও ক্রন্দন। আইক সভয়ে দেখলো, বাজপাখিটা মেয়েটার একটা চোখকে প্রায় উপড়ে

ফেলেছে। চোখটা সামান্য উপশিরার উপর ঝুলছে। আবার উড়ে এল এল দুটো বাজপাখি। একটা পাখি ছোঁ মেরে আক্রমণ করে মেয়েটির কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেললো পুরু চামড়ার পারকা ভেদ করে। হুহু করে রক্ত বেরিয়ে এল। আরেকটা যমপাখি মেয়েটার মাথায় বজ্র চঞ্চুর আঘাত করে খুলি ফাটিয়ে প্রায় ঘিলু বের করে ছাড়লে। সে আঘাতে মেয়েটির রক্তাক্ত বিকৃত মস্তক দেখে আইকের পেট গুলিয়ে মাথা ঘুরে গেল। মেয়েটির গোঙানী অসহনীয়। চিৎকার করে ও হাতের দড়ি ঘুরিয়ে আইক বাজপাখিদের তাড়াবার চেষ্টা করতে ভয়াবহ পাখিগুলি তখন ওকে আক্রমণ করল। আইক হাতের কুড়ুল দিয়ে গোটা কয়েক বাজপাখিকে ধরাশায়ী করে ফেললো। অতঃপর দড়ি প্রাণপণে টেনে অচৈতন্য মেয়েটাকে ওপরে এনে কাঁধে তুলে অতি কষ্টে পাহাড় থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে এল। মাথার ওপর হতাশ তথা ক্রুদ্ধ বাজপাখিগুলি আক্রমণ করবার তালে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো।

মেয়েটাকে স্লেজে শুইয়ে স্লেজ ছেড়ে দিল আইক। তারপর তাকে নিজ কুটিরে এনে তুললো। দেখে ভয় পেয়ে গেল প্যারিস, উঁহু এটা মোটেই ভাল কাজ করো নি বন্ধু। শিভালরি দেখাতে গেছ বটে কিন্তু এতে সমস্ত গ্রাম তোমার বিরুদ্ধে যাবে জেনো। মহা বিপদ হবে দেখছি।

প্রথম দেখলো টেগলক। সারা উপনিবেশে ছড়িয়ে গেল সংবাদ। রোজা শুনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ, প্যারিসকে সরাসরি জানালো, ঐ লাল চুল দাড়িওয়ালা জানোয়ারটাকে আর এখানে কিছুতেই বসবাস করতে দেব না। ও যা অপরাধ করেছে তার জন্য আমি শাস্তিবিধান করলাম আমাদের এখানকার সব সেরা পাথর ছুড়িয়ে পালোয়ান ওগ্‌কোলেক-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। কিডলু যুদ্ধে ঐ পাষণ্ড আইককে অবতীর্ণ হতে হবে। ওকে এ কথা জানিয়ে দাও।

—বেশ তাই হোক, উপায়ান্তর না দেখে প্যারিস বাধ্য হল রাজী হতে, তবে তোমরাও জেনে রাখো এই গুডা আইকও কিন্তু মহা-

শক্তিশালী মানুষ। লড়াইতেই তার প্রমাণ হয়ে যাবে।

—বেশ তো দেখব কত বড় বাহাদুর।

পরদিন দুপুরে এস্কিমোরা জড়ো হল এসে। কারুর হাতে কাঠের বর্শা, কারুর গদা, একজনের কাঁধে একটা পুরনো গাদা বন্দুক, অপর একজনের হাতে হারপুন ও ধনুক।

একটা বরফজমা দীর্ঘ প্রান্তরে—প্রায় দুশো গজ দূরত্বে দুটো অজব যন্ত্র বসানো। কাঠের ফ্রেমে ইস্পাতের পাতকে তিমির অন্ত্রের দড়ি দিয়ে বাঁকিয়ে পাথরের ১০।১২ পাউণ্ড ওজনের গোলা দিয়ে পরস্পরের দিকে নিক্ষেপ করা চলে। অনেকটা বিশালকায় দেশীয় গুলতির ক্রিয়াকলাপ সদৃশ ব্যাপার। এই প্রস্তর গোলা ছোঁড়াছুঁড়ি চলতে থাকবে যতক্ষণ না একজন সরাসরি আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যাবে এবং মৃত্যু মুখে পতিত হবে। মজা দেখতে এস্কিমোরা জড়ো হয়েছে সেখানে।

শুরু হল পাথরের গোলা ছোঁড়া মরণ-খেলা। ওগ্‌কোলেক-এর ছোড়া এক একটা বিশাল পাথর থেকে নিজেকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে যেতে লাগলো আইক। বড় বড় পাথর ছুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল ওজনের জন্যে নিশানা ঠিক রাখা যায় না। এস্কিমোটার অভ্যেস আছে এ যন্ত্রে, ওর তো তা নেই।

একটা পাথর এসে কাঁধে লাগতে আইক ছিটকে পড়ে গেল। এস্কিমো দর্শকেরা উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠলো।

কিন্তু চোখের পলকে সে উঠে দাঁড়ালো। মনে মনে বুঝে নিল ওর মত বিশাল ওজনের প্রস্তরে সুবিধে হবে না। প্রচণ্ডবেগে লাগলে ছোট গোলাতেই কাজ হবে। বন্দুকের গুলি কি বিরাট? সে একটা সিকি পাউণ্ডের প্রস্তরখণ্ড তুলে নিল। ঠিক স্থানে মোক্ষম আঘাত করতে পারলে বাছাধন 'আউট' হয়ে যাবে। হলও তাই। নির্ভুল নিশানা করে তার বক্সিং চ্যাম্পিয়ানের যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে ছুঁড়ে দিল সে প্রস্তর গোলা। দুরন্ত গতিতে সেই পাথরের টুকরো গিয়ে এস্কিমো পালোয়ানের বাঁ কানের ওপর অকল্পনীয় জোরে আঘাত

হেনে তাকে রক্তাক্ত, মাথার খুলি ভগ্ন অবস্থায় ধরাশায়ী করে দিল। দেখা গেল পাথরটা মাথার মধ্যে অর্ধেক সেঁধিয়ে গেছে।

রোজা অ্যাংগকক ত্রস্তে ছুটে গেল, গিয়ে নীচু হয়ে চেয়ে দেখলো, কিছুটা ছটফট করে তার পালোয়ান নিস্তব্ধ হয়ে গেল। প্রাণ হারিয়ে তার বিশাল দেহ বরফের শয্যায় রক্ত ছড়িয়ে পড়ে রইল।

—তুমিই জিতেছ, গুডা, তুমিই উপযুক্ত হে লাল দাড়ি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইকের পানে তাকিয়ে রোজা অ্যাংগকক উচ্চারণ করল। বন্ধু প্যারিসের বুক থেকে প্রচণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস নির্গত হল। সঙ্গে সঙ্গে সে আধ বোতল মদ খেয়ে নিলে একচুমুকে। মেয়েরা আইকের পানে তাকিয়ে ওর বীরত্ব দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

এমন সময় এক কাণ্ড হল। দেখা গেল একটা পাত্রে তিমির অর্ধ সেদ্ধ অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এল সাটটু নাম্নী রোজার তৃতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রীটি।

এটা হল ওদের দলের চিরাচরিত একটি নিয়ম। একটি নারীর একজন পুরুষের কাছে দেহজ আত্মসমর্পণ।

—এই হল প্রকৃত বীর। আমি আর ওর লাল দাড়িতে ভীত নই। আমি ওর সঙ্গে বাস করব এবং ওর সীল মাছ ওর হয়ে ওর জন্যে চিবিয়ে দেব।

অতএব এই তৃতীয় পক্ষ হয়ে গেল আইকের ঘরনী ও শয্যাসঙ্গিনী। এদিকে এরপর দিকে দিকে এই মেয়েটাই শ্বেতাঙ্গ পুরুষের বলবীর্যের কাহিনী প্রচার করে দিল। ফলে আইক অতঃপর যেখানেই যায় মেয়েরা ভিড় করে, ওকে তারা কাছে চায়, হাত ধরে টানে, ইগলুর মধ্যে নিয়ে যেতে চায়।

এরপর দেখা হল সেই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাঙ্গী রূপবতী এস্কিমো মেয়েটির সঙ্গে যার নাম লাবুক। ব্যবসা ব্যপদেশে জিনিস কিনতে গিয়ে আইকের হল ওর সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ। লাবুক এই শ্বেতাঙ্গ গুডাকে চায়। সে স্পষ্টইভাবেই বললে, লাল চুল দাড়িয়ালা এই মানুষটিই খুব পয়া। ওর জন্যে এবার বলগা হরিণ ধরা পড়বে

বেশী। ও যদি স্বয়ং শয়তান ইয়াককও হয়ে থাকে, তবু লাবুক ওর প্রেমালিঙ্গন ভিখারিনী।

অপরাপর মেয়েদের সীল-এর হাড় দিয়ে তাড়া করে তাড়িয়ে দিল লাবুক। দূরে থাকা পুরুষ এস্কিমোদের চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা প্রত্যক্ষ করল আইক।

বিবাহিতা লাবুকের স্বামী গেছে সুদূর ফ্লিন্ট উপসাগরে শিকার করতে। আইককে নিয়ে গেল লাবুক তাদের ইগলুতে, তাদের বিছানায়। মেয়েটি বেশ শান্ত কোমল বাধ্য চরিত্রের। প্রেম ও কামনাময়ীও বটে। প্রথম দিনই আলো নেভানোতে উদগ্রীব দেখে পরিহাস করে সে আইককে বলেছিল, অতো তাড়া কিসের। ভয় নেই, এখানে রাত ছয় মাস দীর্ঘ।

লাবুকের ওষ্ঠ চুম্বনে যুগপৎ আনন্দ ও অপরাপর কলাকৌশল দেখে, আইক বিস্মিত না হয়ে পারল না। তবে মজা এই এ জাতের মধ্যে ঈর্ষা নেই বিশেষ। আইক অপরাপর নারীদের সান্নিধ্যে প্রায়শঃই যেত। সমস্ত ইগলুগুলো ছিল যেন ওর হারেম স্বরূপ!

বয়স্ক প্যারিসের নাকি নিজেরই নজর ছিল লাবুকের প্রতি। তাতে নিরাশ হয়ে সে ব্যবসাণিজ্য ছেড়ে মদে ডুবে রইল। ফলে আইকের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠল। ফার, চামড়া ও অপরাপর দ্রব্যের চূড়ান্ত কেনাবেচা করে প্রচুর লাভবান হয়ে গেল আইক।

ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনায় জলে পড়ে মত্ত-মাতাল প্যারিসের মৃত্যু হল। প্যারিস মারা যেতে আইকের ঝামেলা শুরু হল।

নতুন এক মহাবিপদ এসে উপস্থিত হল। একদিন ওরই এক প্রেমিকা এসে আইককে গোপনে বললে, লোকেরা বলছে তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। ওরা বলছে তুমি প্রকৃত শয়তান, ইয়াকক। তোমার পাপেই বন্ধু গুডা প্যারিস মারা গেছে। সেগুলুক তোমার লাবুককে তার ইগলুতে নিয়ে গেছে, বলছে ও নাকি তার মেয়েমানুষ এখন। কাল সকালেই এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে, নয়ত সে নাকি তোমাকে খুন করে ফেলবে।

—কী! এত বড় কথা। যাও যাব না আমি, রেগে গিয়ে বলে ওঠে আইক। জানাওগে ব্যাটাদের একথা।

—না না তুমি চলে যাও গুডা, মেয়েটি মিনতি করে, নয়ত ওরা তোমাকে 'টুগলুগ' লড়াইতে আহ্বান জানাবে। তাহলে তোমার হবে অবধারিত মৃত্যু।

—ঠিক আছে আঁমি দেখতে চাই তা। আমি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব। আমি যাব না। মরা অতো সহজ নয়।

সকালবেলাই মাদল বাজিয়ে লোকজন এসে হাজির। ওকে তারা নিয়ে গেল। দেখা গেল বেশ বড় জলাশয়ের তীরে একটা খুঁটির সঙ্গে লাবুককে বেঁধে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য সে দেখবে এই জলযুদ্ধে যে জিতবে সে হবে তারই। জলে দুটি বড় বড় গামলার মত সীল মাছের চামড়ায় তৈরী নৌকো। টুগলুগ হল এই গামলা সদৃশ নৌকোয় টালমাটাল ব্যালেন্স রেখে, হাতে ওয়ালরাস-এর বিরাট একখণ্ড হাড় অস্ত্রস্বরূপ নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করা—যে হারবে, তারই হবে মৃত্যু। জিতলে পুরস্কার ঐ তরুণী।

এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হল ডাকিনীবিদ্যাবিশারদ রোজার পুত্র সেই কুখ্যাত সেগলুক স্বয়ং। সে একটি গামলা নৌকোর ওপর সদম্ভে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, আয়, ওরে গুডা চলে আয়, তোর মরণকাল উপস্থিত হয়েছে।

কোন রকমে টাল সামলে নিয়ে গামলা নৌকোয় উঠল আইক। হাতে নিল একদিক তীক্ষ্ণধার একটি এক হাত দীর্ঘ ওয়ালরাসের হাড়। আচমকা একটি আঘাত করলো সেগলুক শ্বেতাঙ্গ আইককে। প্রচণ্ড ব্যথা পেল আইক কাঁধে। সামলে নিয়ে সেও হাঁকড়ালো এক ঘা এস্কিমোকে। এইভাবে চলতে চলতে একবার টাল সামলাতে না পেরে আইক পড়ে গেল হিমশীতল জলে। আর তক্ষুনি হাতের ভয়াবহ হাড়ের অস্ত্র দিয়ে সেগলুক নিদারুণ আঘাত হানতে উদ্যত হল জলমগ্ন সাহেবকে। কিন্তু আইক হল বক্সিং চ্যাম্পিয়ান মহাশক্তিধর মানুষ। অবিশ্বাস্য এক প্রচেষ্টায় জলের উপর দেহের আধখানাকে ভাসিয়ে তুলে

হাতের তীক্ষ্ণধার হাড়টি সমূলে বসিয়ে দিল এস্কিমোর বুকে। মোক্ষম নির্ভুল আঘাত। ফিনিক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে হতচৈতন্য করে ফেললো সেগলুককে। টলে পড়ে গেল সে ঝপাং শব্দে জলের মধ্যে। জলের মধ্যেই এক প্রচণ্ড ধাক্কায় শত্রুর প্রাণহীন দেহকে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিল আইক।

অতঃপর কাঁপতে কাঁপতে বরফ শীতল জল থেকে উঠে এল শ্বেতাঙ্গ গুডা। উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল এস্কিমোদের চোখেই ভয়ভীতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা। স্বয়ং রোজা ডাক্তার অ্যাংগককও মাথা নীচু করে ডান হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে নস্যর পাত্র সমেত।

এইভাবে কুশককউইম এস্কিমোদের মধ্যে নিজের একাধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তার করে বহুকাল ব্যবসা-বাণিজ্য করে গেছে বক্সিং চ্যাম্পিয়ান আইক ব্রিজেস।

লুবককে সে তার স্বামীর কাছ থেকে ১০ পাউণ্ড তামাক ও একটি খেলনা হাতঘড়ি দিয়ে কিনে নিয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত লুবকই ছিল আইকের মেরুদেশের সহচরী ও শয্যাসঙ্গিনী। অবশ্য অপরাপর ইগলুতেও তার অবাধ গতায়াত ছিল। আসলে সব ইগলুই ছিল তার এক-একটি হারেম।

ফ্লোরেসেন্ট কাউ

এই পরমাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটেছিল মার্কিন মুলুকে, এক কৃষক পরিবারের ফার্ম এলাকায়।

চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ফার্ম মালিক জ্যাক স্টুয়ার্ট ও মিসেস স্টুয়ার্ট অর্ধেক রাত থাকতে উঠে ব্রেকফাস্ট অন্তে লেগে যায় ফার্মের হাজারো কাজ করতে, তারপর দীর্ঘ সময় শেষে সূর্য যখন পাটে নামে তাদের চল্লিশ একর ফার্মের দিক-চক্রবালে, তখনই তারা বিশ্রামের সময় পায়।

সেদিনও ঘনান্ধকার রাত চারটের সময় টেবিলে বসে ঘুমন্ত চোখে কাফ কাপে চুমুক দিচ্ছিল জ্যাক।

পাশে দাঁড়ানো বিশালকায় মিসেস স্টুয়ার্ট উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল. ছাখো জ্যাক আর চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থেকো না বাপু। যে করেই হোক জুনিয়াসকে আজ তোমায় খুঁজে বার করতেই হবে। ভগবান জানেন, বেচারা কোথায় গেল, কি হল। ভেবে দেখো কাল সকালের পর আর ওর দুধ দোয়ানোও হয় নি।

—ঠিকই বলেছ, চিন্তিত ভাবে জ্যাক টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো. যাই আবার উত্তর দিকের বনে ওর খোঁজ করি। যদি এবারও না পাই তাহলে আমি আশা ছেড়ে দেব।

সহসা বাইরে একটা কুকুর আর্তনাদ করে উঠল, মুহূর্তের জন্য ওদের দুজনের মধ্যে নেমে এল নিস্তব্ধতা, পরক্ষণে জ্যাক চিৎকার করে বলে উঠলো, আরে, এ যে রোবি। বলেই সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে জ্যাক দেখতে পেল পেছনের পায়ে ভর করে কেঁউ কেঁউ করতে করতে কুকুরটা এগিয়ে আসছে। চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। আর পাগলের মত সামনের পা দিয়ে চোখ আঁচড়াচ্ছে

—বেজির সঙ্গে লড়াই হয়েছে বুঝি? জ্যাক কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু কই স্কাঙ্ক জাতীয় বেজির উগ্র উৎকট গন্ধ তো ওর গায়ে নেই।

কুকুরটা ভীষণভাবে ছটফট করছে ক্ষ্যাপার মত। না, তাহলে তো বেজির সঙ্গে লড়াই নয়। অন্য কোন কারণে ওর চোখে জল ঝরছে। তাছাড়া চোখ দুটো জবার মত লালও হয়ে উঠেছে দেখছি। হাঁটু গেড়ে বসে জ্যাক পরমাদরে কুকুরের মুখটা দুহাতে তুলে ধরে পরীক্ষা করলো। তারপর বালতি থেকে জল এনে কয়েক ঝাপটা জল ওর চোখে দিল। রুমাল দিয়ে চোখটা মুছিয়ে দিল।

—ওহ রোবি, কি করে তোর এমন হল। কুকুরটা সমানে কেঁউ কেঁউ করে আর্তনাদ করে চলেছে।

—কি হল ওর, ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে মিসেস স্টুয়ার্ট প্রশ্ন করে।

—কি করে বলব, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে চোখে কিছু একটা হয়েছে।

—স্কাঙ্ক?

—না বেজি নয়। ওর গায়ে বেজির গন্ধ পাচ্ছি না। অন্য কিছু হবে?

—বেড়াল?

—তাহলে তো আঁচড় কামড়ের দাগ থাকত। ওর ছটফটানিতে মনে হয় চোখে প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে।

—এক কাজ করো, ওকে বার্ণে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে তুমি জুনিয়াস-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়।

—ঠিক আছে। আয় রোবি, বলে কুকুরটাকে বার্ণ-এ নিয়ে একটা ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে একটা লণ্ঠন নিয়ে এল। ভারি জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে মাথায় ক্যাপ পরে স্ত্রীকে বললে, যদি উত্তরের বনে ওকে না পাই তাহলে ফিরে এসে ট্রাক নিয়ে চলে যাব লিমার্সদের ওখানে—যদি সেদিকে সে চলে গিয়ে থাকে। ওরা যদি দেখে থাকে ওকে।

লণ্ঠন হাতে জ্যাক তার ফার্মের উত্তর দিকের জঙ্গল অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। পুব দিকে প্রত্যূষের ক্ষীণ আভা চোখে পড়লো।

কিন্তু তার চেয়েও বেশি আভা নজরে পড়ল উত্তর দিকে। ব্যাপার কি। সকাল হবে পুব দিক থেকে। উত্তর দিকে আলো ফুটছে কেন? তার প্রথমেই চিন্তা এল, তবে কি আগুন? কিন্তু আগুন হলে তো ধোঁয়া থাকতো, শিখা থাকতো। তা তো নেই।

সেই অজ্ঞাত আলোকরশ্মির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বিস্ময়াবিষ্ট মনে উত্তরের বনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। সে আলো গাছের মাথা ছাড়িয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে। অতিকাল মধ্যেই সে জঙ্গলের কাছে এসে উপস্থিত হল। আলোটা ক্রমশই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। অতি সতর্কভাবে সে এগোতে থাকলো। একেবারে কাছে এসে সামনে একটা ঘন ঝোপ পড়লো। মনে হল তার অপর পাড়েই আলোর উৎসটা।

ঝোপকে পাশ কাটিয়ে এসে যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো প্রথমে বিস্ময়ে সর্বাঙ্গ প্রায় অবশ হয়ে গেল আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল উদ্ভট এক আর্ত চিৎকার। অতঃপর দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

প্রথমটা মনে হল সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। আঙুলের ফাঁকে সে চাইল সেদিকে। চোখ ধাঁধানো সে আলোক রশ্মি। তা সত্ত্বেও সে বোবা হয়ে দেখলো তার সাধের গোরু জুনিয়াস যে ইলেকট্রিক বালবের মত জ্বলে রয়েছে, তার দেহ থেকে আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ যেন রক্ত মাংসের গোরু নয়, একটি আলোর গোরু। নীল ও সাদা আলো বেরিয়ে আসছে ওর দেহ থেকে। অথচ বিস্ময়ের কথা সে সমানে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণের জন্য জ্যাক চলৎশক্তি রহিত হয়ে রইল। চোখ তার জ্বালা করছে ভীষণ ভাবে। আর হু হু করে জল পড়া শুরু হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ সে মুখ ঘুরিয়ে নিল সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য থেকে।

অতঃপর জ্যাকের স্মরণ নেই সে কিভাবে দৌড়ে ফের তার ফার্ম বাড়িতে ফিরে এসেছে, কিভাবেই বা অসংলগ্ন বাক্যে সেই অকল্পনীয় দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছে স্ত্রীর কাছে। এক গ্লাস কড়া মদ পান করে তবে সে কিছুটা ধাতস্থ হয়, তার চিন্তা শক্তি ফিরে আসে। জ্যাকের কথা

অতীব ধৈর্য সহকারে ও বিচিত্র দৃষ্টি নিয়ে তার স্ত্রী সব শুনে গেল।

স্ত্রী বললে, অসম্ভব। অবিশ্বাস্য। আমি নিজে যাচ্ছি দেখতে। গিয়ে যদি দেখি তোমার কথা মিথ্যে তাহলে কিন্তু—বলে রোষ কষায়িত নেত্রে এমন ভাবে তাকিয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হল যে তড়াক করে জ্যাক দাঁড়িয়ে উঠে স্ত্রীর পথ আগলে দাঁড়ালো এবং বললে :

—বিশ্বাস করো ডার্লিং, যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। তুমি যেও না ওখানে। তুমি সহ্য করতে পারবে না সে দৃশ্য।

—মূর্খের মত কথা বলো না তো। এমন গাঁজাখুরি কথা আমি জন্মে শুনিনি, গোরু কিনা জ্বলছে সূর্যের মত—ছো।

—বেশ তুমি বাইরে মাঠে চল আমার সঙ্গে সেখান থেকেই তুমি সে আলো দেখতে পাবে।

—ঠিক আছে চলো। যদি না হয় তো—রাগে আর কথা শেষ করলো না সে।

মাঠে নামতে উত্তরের বনের গাছের মাথায় দেখা গেল আলোক রশ্মি।

—ঐ দেখো, চেয়ে দেখো মিথ্যে বলছি কিনা।

—চলো কাছে যাই, মনে হচ্ছে আগুন লেগেছে।

—না না ডার্লিং, আগুন নয়। বিশ্বাস করো জুনিয়াস যেন ক্রিশমাস ট্রির মত জ্বলছে।

—জ্যাক, তোমার ঐ পাগলের মত কথাবার্তা থামাও বলছি। প্রত্যেকটা বস্তুরই কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। আমি নিশ্চিত এর পেছনেও অবশ্য একটা কারণ রয়েছে।

—কারণ তো জুনিয়াস ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারছি না। দুপুরের সূর্যের মত সে চতুর্দিক আলোকিত করে ফেলেছে। যেন একটা বিশালকায় বালবের মত জ্বলছে। আর ভয়ঙ্কর ভাবে আলো ছড়াচ্ছে।

মিসেস স্টুয়ার্ট দ্রুতপদে এগিয়ে যেতে লাগলো, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। এই ননসেন্স-এর শেষ হওয়া দরকার। আর তো

সহ্য করতে পারছি না।

—যা খুশী কর। তবে খবরদার ভালভাবে তাকিও না ওর দিকে. চোখ ঝলসে যাবে তাহলে। রোবি বেচারা বোধ করি ওর পানে তাকিয়েই চোখের বারোটা বাজিয়েছে।

মিসেস স্টুয়ার্ট এগিয়ে গিয়ে সেই ঝোপ সরিয়ে তাকাতে বিস্ময়ে তারও রক্ত হিম হয়ে গেল। জুনিয়াস নিয়ন সাইনের মত জ্বলছে, তবে সে আলো মার্কারি ল্যাম্পের চেয়েও তীব্রতর। চীৎকার করে উঠে মিসেসও দু'হাতে মুখ ঢাকলো। জ্যাক তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ধরে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এল।

—হায় হায় একি হল, এ যে কল্পনাতীত। এখন আমরা কি করব জ্যাক। বেচারা জুনিয়াস।

—একটিই করবার আছে। এখুনি আমি ইউনিভার্সিটিতে ফোন করে ওখানকার বিজ্ঞানীদের আসতে বলব। তারা এসে যা হয় একটা কিছু করুক।

—তোমার কি মনে হয় তারা একেবারে কাছে গিয়ে ওর দুধ দুইতে পারবে? এ অবস্থায় ও দুধ দেবে কি?

স্ত্রীর এই হাস্যকর কথা শুনে জ্যাক হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। যার যা চিন্তা, হায়রে বাস্তববাদী রমণী। মুখে বললে, দেখা যাক। তারা এসে যা ভাল বোঝে তাই করবে। মনে হয় ওকে তারা গাড়ি করে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাবে এবং কিভাবে এরকম হল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে।

—এর চেয়ে ভেটেরিন্যারি ডাকলে হত না। হয়ত এটা নতুন কোন রোগ হবে।

—না না ডার্লিং, এটা মোটেই কোন রোগ নয়। এ ধরনের ব্যাপার তাবৎ দুনিয়ার কেউ কখনো দেখেনি বা শোনেওনি। এখন বলে কয়ে ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের আনতে পারি তবেই না।

—তুমি একবার দড়ি নিয়ে চেষ্টা করে বাঁধতে পারবে কি জুনিয়াসকে যাতে না কোথাও পালিয়ে যায়।

—একটু ধৈর্য ধরো। বিজ্ঞানীরা আসুক, তারা কি করে দেখা যাক। তাছাড়া জুনিয়াস পালালেও ওর আলো দেখেই আমরা সন্ধান পাব।

বেলা আটটা নাগাদ জ্যাক ফোন করল ইউনিভার্সিটিতে।

সেখানকার সুইচবোর্ড অপারেটার ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠলো, গুড মর্নিং? স্টেট ইউনিভার্সিটি।

—মর্নিং ম্যান। আমি আপনাদের একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—নাম বলুন, বিশেষ করে কার সঙ্গে কথা বলতে চান আপনি?

—যিনি ব্যস্ত নন এরকম যে কোন বিজ্ঞানী। আমার খুব গুরুতর একটা ব্যাপার তাঁকে বলবার আছে।

—আমি যদি জানতে পারতাম ব্যাপারটা কি, অপারেটার কিছুটা উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে, তাহলে ঠিক উপযুক্ত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারতাম।

জ্যাক একটু ইতস্ততঃ করল। একটা নগণ্য অপারেটারকে সে তার চমকপ্রদ সংবাদ দিতে নারাজ। তাই ঘুরিয়ে বললে, এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি লাইট-টাইটের ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

—ও, আপনি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ল্যাবরেটরিকে চান। এক মিনিট স্যার।

জ্যাকের কানে এর পর কতগুলি ক্লিক ক্লিক ধ্বনি ও পরে বেল বাজার শব্দ এল। অতঃপর ভারী কণ্ঠের:

—হ্যালো!

—হ্যালো। এটা কি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ল্যাবরেটরি?

—হ্যাঁ।

—বেশ। আমার নাম জ্যাক স্টুয়ার্ট। স্মিথ ভাইলের বাইরে ক্যানেল রোডের ধারে চল্লিশ একর-এর এক ফার্মের মালিক আমি।

—আমি হলাম প্রফেসর ডোনেল। আপনার কি উপকারে লাগতে পারি বলুন।

—মানে, জ্যাক গভীর এক নিশ্বাস নিয়ে শুরু করলো, আমার গোরু জুনিয়াস গতকাল সকাল থেকে হারিয়ে যায়। আজ সকালে তাকে পেয়েছি।

—মিস্টার স্টুয়ার্ট! এবার অধৈর্য কণ্ঠে প্রফেসার ডোন্নেলি বলে ওঠে, বহু ক্লাস নিতে হয় আমাকে, আমি নিদারুণ ভাবে ব্যস্ত মানুষ। আপনি আপনার গোরুকে খুঁজে পেলেন কি পেলেন না তাতে আমার কি এসে যায়।

—এসে যাবে যদি স্যার আপনি শোনেন কি ভাবে আমি জুনিয়াসকে পেলাম তা শোনেন।

—বেশ বেশ মিস্টার স্টুয়ার্ট। তাহলে আপনি কি কোন নতুন ধরনের র‍্যাডার-এর সাহায্যে আপনার গোরুকে খুঁজে পেলেন?

—না স্যার। আমি তাকে পেয়েছি একটা উজ্জ্বল আলোকে অনুসরণ করতে গিয়ে। আমার উত্তর দিকের বনে সে আলো দেখে এগিয়ে গিয়ে আমি দেখি আমার গোরু জুনিয়াস নিয়ন সাইনের মত জ্বলছে।

—মিস্টার স্টুয়ার্ট, কতটা মদ গিলেছেন আপনি?

—আমি জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না আমার কথা। শুধু অনুরোধ আপনি নিজে এসে দেখে—

জ্যাকের কানে খট করে একটা আওয়াজ এল, তার পরেই বাজিং-এর শব্দ। বোঝা গেল প্রফেসার ডোন্নেলি ফোন কেটে দিয়েছে।

ফোন রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় করাঘাত হল। জ্যাক দরজা খুলতেই দেখলো ছ'জন স্টেট ট্রুপার (পুলিশ) আর অভিজাত চারজন সিভিল ড্রেস পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ইনচার্জ জাতীয় পুলিশটি বলে উঠলো, দেখুন স্যার আপনাকে বা আপনার স্ত্রীকে অযথা ভয় পাওয়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার উত্তর দিকের জঙ্গলে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে। এই ভদ্রলোকেরা হলেন ইউনিভার্সিটির অ্যাটমিক রিসার্চ ল্যাবরেটারির লোক। এরা নিশ্চিত যে একটা উড়ন্ত চাকি আপনার

ঐ বনে অবতরণ করেছে।

—না না ওটা কোন উড়ন্ত চাকি নয়, জ্যাক বলে।

—নয়? সেই ভদ্রলোকদের একজন হতাশ কণ্ঠে বলে, তাহলে কি ওটা?

—ও আমার গোরু জুনিয়াস।

—আপনার কি? কি বললেন! পুলিশটি পরম অবিশ্বাসে বলে ওঠে, মাথা খারাপ নাকি আপনার।

রাগত কণ্ঠেই এবার জ্যাক বলে যায়, ঠিক আছে আপনারা ওখানে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসুন, তারপর বলুন আমার মাথা খারাপ কি না।

শুনে ওরা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

জ্যাক ও তার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না দলটি বনের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

—দেখবে এখুনি ওরা পড়ি কি মরি করে ছুটে ফিরে আসবে।

সত্যিই তাই। কয়েক মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল সে দলটি চোখে হাত চাপা দিয়ে প্রায় ছুটে আসছে ওদের বাড়ির দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল তারা। পুলিশ ইনচার্জ জ্যাককে ডেকে জিগ্যেস করলে, হ্যাঁ মিস্টার, ঐ গোরুটার এ অবস্থা হল কি করে?

—আমি কি করে জানব, জ্যাক জবাব দেয়, ঐ অবস্থায়ই আমি ওকে পেয়েছি।

এবার অভিজাত ধরনের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললে, আমি আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে চাই।

ফোনের কাছে গিয়ে ভদ্রলোক কম্পিত হস্তে ডায়েল করলেন। কানেকসন পেতে বলতে লাগলেন, আমি স্টেট ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট প্রফেসর জোনাথন সিমস বলছি। আমায় এখুনি গভর্নরকে কানেকসন দিন। ব্যাপারটা বিশেষ জরুরী।

কিছুক্ষণ অধৈর্য প্রতীক্ষা। অতঃপর :

—হ্যালো ! হ্যালো গভর্নর ? প্রফেসর সিমস বলছি। আমি এখুনি একদল ন্যাশনাল গার্ডস-মেন চাই ক্যানেল রোডের ধারে জ্যাক স্টুয়ার্টের ফার্ম ঘিরে রাখবার জন্যে। এখানে এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। আমার জরুরী অনুরোধ যে এখুনি এই অঞ্চলটাকে কঠোর সিকিউরিটির আওতায় আনা হোক এবং এ ব্যাপারে অবিলম্বে ফেডারেল গভর্নমেণ্টকে অবহিত করা হোক।

—আরে শুনুন শুনুন এক মিনিট, জ্যাক যেন কি বলতে যায়।

তাকে ইসারায় থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক ফোনে কান পেতে অপর পক্ষের কথা শুনতে থাকেন।

—স্যার, কি বললেন স্যার। আপনি নিজে না দেখলে এটা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমাদের নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে যে একটা উড়ন্ত চাকি এখানে অবতরণ করেছে। মিঃ স্টুয়ার্টের গোরুটার সর্বাঙ্গ থেকে ফ্লাইং সসারের অনুরূপ নীল ও সাদা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সিমস গভর্নরের কথা শোনবার জন্য থামলেন। পরে মাথা নেড়ে বললেন, না না অনেস্টলি স্যার, আমি মাতাল নয় স্যার। সত্যি সত্যি গোরুটার গা থেকে আলোক রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে।

—এবার বুঝুন। আমার কথাও কেউ বিশ্বাস করছিল না, আমিও কি রকম আহাম্মক বনে যাচ্ছিলাম, আত্মপ্রসাদের সুরে জ্যাক বলে ওঠে।

সিমস ওর কথা গ্রাহ্য না করে ফোনে মনোনিবেশ করলেন, হ্যা স্যার, একজন স্টেট ট্রুপার এখানে উপস্থিত আছে। পুলিশ ইনচার্জের পানে তাকিয়ে বললেন, স্যার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ট্রুপার রিসিভার তুলে বললে, হ্যালো গভর্নর হাইওয়ে পেট্রলের সার্জেণ্ট লেস জনসন বলছি। ব্যাপারটা সত্যি স্যার। বহু লোকই এটা দেখেছে। আমি নিজেও দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ নীল এবং সাদা আলো। না স্যার, আমাদের কোন মদের পার্টি ছিল না। আজ সকালে কন্টিনেন্টাল এয়ারওয়েজ-এর একজন পাইলট এই আলোর কথা রিপোর্ট করে। তারপরই আমরা তদন্তে চলে আসি।

তারপর সিমসকে রিসিভার দিয়ে বলে, স্যার ফের আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

অবশেষে গভর্নর হয়ত কিছুটা বিশ্বাস করলেন যে স্টুয়ার্টের ফার্মে কিছু একটা আজগুবী ব্যাপার ঘটেছে তবে তিনি একজন বিশিষ্ট নাগরিক এবং জনগণের বিশ্বস্ত সার্ভেণ্ট হিসেবে, যে জনগণ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, সেই তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না পুরোপুরি প্রফেসর ও ট্রুপার বর্ণিত উদ্ভট ঘটনা। তাই তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার সংকল্প করে তাঁর সোফারকে ডেকে পাঠালেন।

ইতিমধ্যে মিসেস স্টুয়ার্ট প্রফেসর সিমসকে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলবেন কি যে জুনিয়াস-এর দুধ দোয়া যাবে কিনা।

—এখনও আমি সঠিক করে কিছু বলতে পারছি না মিসেস স্টুয়ার্ট। সর্বপ্রথমে আমাকে অনুসন্ধান করে জানতে হবে কতটা স্থান ক্ষতিকর রেডিও অ্যাকটিভিটি ছড়িয়েছে। তারপরে আমি গোরুটাকে চেক করব।

বলে ফের তিনি ফোন তুললেন। কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব আবেগমুক্ত রেখে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ইউনিভার্সিটিতে তার লেবরেটারিকে ধরলেন, চেয়ে পাঠালেন নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি যথা, গেইগার কাউন্টার, গামা-রে ডিটেকটর, পোর্টেবল লেড শীল্ড, বডি এবং টেম্পারেচার থার্মোমিটার, পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন এবং ডজনখানেক কালো চশমা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসব পৌঁছে গেলে প্রফেসর সেগুলো তার অ্যাসিস্টেন্টদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন নানা নির্দেশ সহ। বোঝা গেল তিনি একাই প্রথমে স্মোক্‌ড্ গ্লাস পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জুনিয়াসের কাছে যাবেন, সঙ্গে নেবেন লেড শীল্ডটা। পরীক্ষায় যদি প্রমাণ হয় যে জুনিয়াসের কাছে যেতে কোন ভয় নেই তখন তিনি সহকারীদের ডাকবেন।

—আপনাদের প্রত্যেককে সেই উড়ন্ত চাকীর প্রাণীদের মতই দেখাচ্ছে, বলে হেসে উঠল জ্যাক।

এবার সিমস একা রওনা হয়ে গেল উত্তর বনের পাশে। দিনের আলোতে এখন সেই অদ্ভুত আলোটা কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে।

ফার্ম বাড়ি থেকে এরা তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ না প্রফেসর বনপথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একজন সহকারী হাত ঘড়ির পানে তাকিয়ে বলে ওঠে, আশ্চর্য তো! প্রায় কুড়ি মিনিট হল গেছেন। এতক্ষণ কি করছেন প্রফেসর।

—আমার মনে হয় উনি দুধ দুইছেন, আশা ব্যঞ্জক কণ্ঠে মিসেস স্টুয়ার্ট বলে ওঠে।

শুনে সহসা জ্যাক হেসে উঠলো।

—হাসবার কি আছে জ্যাক? স্ত্রী জিগেস করে।

—হাসছি এ জন্যে যে জুনিয়াসই হবে পৃথিবীর প্রথম গোরু যে রেডিয়েটেড দুধ দেবে।

আরো পনের মিনিট কাটবার পর দেখা গেল প্রফেসর সিমস বন থেকে বেরিয়ে আসছেন। কাছে এলে দেখা গেল কালো চশমাটা কপালে তোলা আর হাতের একটা নোটবুক-এর প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি এগিয়ে আসছেন। আর মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাচ্ছেন।

কাছে আসতে সহস্র প্রশ্ন নিয়ে সবাই তাকে ঘিরে ধরলো।

সবাইকে হাত তুলে চুপ করতে বলে তিনি বললেন, আমি আমার সহকারীদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। সার্জেন্ট জনসন, আমরা যতক্ষণ কনফারেন্সে বসছি ততক্ষণ আপনি ঐ স্থানটাকে ঘিরে পাহারায় থাকুন।

—ওর কাছাকাছি যাওয়া কি নিরাপদ হবে? প্রশ্ন করে সার্জেন্ট।

—সে ভরসা আমি দিচ্ছি, কোন ভয় নেই। অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণ রেডিও অ্যাকটিভিটি বিদ্যমান, আর আলট্রাভায়োলেট রে-ও

উল্লেখযোগ্যভাবে নেই। তবে আপনারা কালো চশমা অবশ্যই পরে থাকবেন।

পরে সহকারীদের পানে তাকিয়ে বললেন, আসুন আপনারা।

—জুনিয়াসকে কি ছোঁয়া যাবে? মিসেস স্টুয়ার্টের আকুল প্রশ্ন।

এ মূঢ় প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিজ্ঞানীরা গিয়ে ডাইনিং রুমের বড় টেবিলটার চারদিকে বসে আলোচনায় মগ্ন হল।

—জেন্টলমেন, সিমস বলতে লাগলেন, একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপারই সংঘটিত হয়েছে। ঐ গোরুটি একটি মিনিয়েচার অ্যাটমিক পাইলের মত জ্বলন্ত। এ অবস্থায় আমরা জানি গোরুটার মুহূর্তে মরে গিয়ে কাঠ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা গোরুটা কিনা সহজভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয় যেন কিছুই হয় নি এমন-ভাবে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে, জাবর কেটে চলেছে।

—এতে আপনার থিওরী কি প্রফেসর?

—একটি থিওরীই আমার আছে—এবং সেটি হল খুবই ফ্যানটাস্টিক।

—খুলে বলুন, আমরা তা শুনতে চাই।

—আপনাদের স্মরণ আছে কি যে এই অঞ্চলে কি রকম ঘন ঘন উড়ন্ত চাকিদের দেখা গেছে?

—তা স্মরণ আছে।

—বেশ, সিমস বলে গেলেন, আমার অভিমত হল সত্যি সত্যিই একটি উড়ন্ত চাকি ওখানে অবতরণ করেছিলো এবং দুর্ঘটনাক্রমেই গোরুটি সামনাসামনি পড়ে যায়। তারা হয়ত জুনিয়াসকে রেডিয়াম রে গান দিয়ে বা আমাদের অজানা কোন তেজোময় বস্তু দ্বারা গুলি করে।

—জুনিয়াস তা হলে মারা গেল না কেন?

মাথা নাড়লেন সিমস, তারা ওকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছিল। সে যাই হোক জেন্টলমেন, এর দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। এর ফলে গোরুটা জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে, দ্বিতীয়ত নড়া-চড়ার

শক্তি রহিত হয়েছে আর, বলে সিমস টেবিলের উপর দুহাত ন্যস্ত করে জানায়, আর হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ।

—অঁ্যা, বলেন কি স্যার? স্বচ্ছ? কি ভাবে?

—আমি গোরুটার দু ফুটের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম, আমি ওর চামড়ার হাত দিলাম, এবং কালো চশমার ফাঁকে দেখতে পেলাম ওর কঙ্কালময় দেহটাও, চেস্ট ক্যাভিটি, হৃদস্পন্দন, অন্ত্রের যাবতীয় অংশ সবসেরা এক্স-রে তে যেমন দেখা যায় তার চেয়ে আরও স্পষ্ট দৃশ্যমান দেখলাম।

সহকারীরা সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

—বসুন বসুন আপনারা। গোরুটা কোথাও যাবে না, যেতে সমর্থ হবে না। আমাদের গভীর বৈজ্ঞানিক মন নিয়েই এ ঘটনার বিশ্লেষণ বিচার আবার করতে হবে।

—কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভ্যান আসবে। তারপর গোরুটাকে তুলে নিয়ে চলে যাব ল্যাবরেটারিতে, যাতে করে আরও বিশদ ভাবে ওকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এখন আমার বিশ্বাস হল যে উড়ন্ত চাকি দ্রুত উঠে পড়ে চলে যায়। এত অকস্মাৎ তার নির্গমন যে তারা ওর দীপ্যমান দেহকে নিভিয়ে যাবার পর্যন্ত সময় পায় নি বা স্রেফ ভুলে গেছে নেভাতে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস তারা আবার অচিরেই এখানে ফিরে আসবে ওর খোঁজে। তাই আজই ওকে সরিয়ে ফেলে আমরা এখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করব।

—চমৎকার আইডিয়া প্রফেসর সিমস, সবাই একবাক্যে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

সহসা ওদের কানে এল কলরব ও চীৎকার। জানলা দিয়ে দেখলো সার্জেন্ট জনসন প্রান্তরের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে কি নির্দেশ করতে করতে ছুটে আসছে।

সিমস ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। সার্জেন্ট কাছে আসতে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে প্রশ্ন করল, কী, কী ব্যাপার?

—কালো আলো! কালো আলো!! আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাঁপাতে হাঁপাতে সার্জেন্ট বলে ওঠে।

সিমস ওপর দিকে চাইলেন, কিন্তু গ্রীষ্মের নীলাকাশ ও কয়েকটা উড়ন্ত পাখি ছাড়া আর কিছু তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না।

প্রফেসর সার্জেন্টের কাঁধে প্রবল ঝাকুনি দিয়ে প্রশ্ন করেন, বলো ম্যান বলো, কি ঘটনা ঘটেছে?

—কালো আলো এসে পড়ল গোরুটার ওপর। সাংঘাতিক কালো আলো, অকল্পনীয় সে কাজল কালো আলোক রশ্মি।

ও কি বলতে চাইছে তা সম্যক অনুধাবন করবার জন্য সবাই ওর চারদিকে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সবাই এত তন্ময় যে মিসেস স্টুয়ার্ট ছাড়া কারুরই নজরে পড়ে নি ধীর পায়ে কখন এসে জুনিয়াস ফার্ম বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে সবার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

—জুনিয়াস! চীৎকার করে ওঠে জ্যাক-গিন্নী।

—মু উ উ উ উ...!

সমবেত জনতা তাকিয়ে দেখে রক্ত মাংসের সাধারণ গোরু জুনিয়াস দাঁড়িয়ে রয়েছে গেট-এর কাছে।

—জ্যাক জলদি গিয়ে বালতিটা নিয়ে এস, মিসেস স্টুয়ার্ট হাঁকডাক করে ওঠে, জুনিয়াসকে দুইতে হবে, ও আবার ঠিক হয়ে গেছে।

সহসা সমবেত জনতা ঊর্ধ্বমুখ করে আকাশ পানে তাকালো, দেখলো, দিক্ চক্রবালের বহু ওপর দিয়ে অস্পষ্ট রুপোলী একটা চাকি নিদারুণ গতিতে মহাশূন্যের পথে চলে যাচ্ছে।

ওয়ার-উলভ্

পশ্চিম ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র এক রেলওয়ে স্টেশনের ততোধিক ছোট, এক ওয়েটিং রুম। সেখানে ছোট একটি গোলাকৃতি টেবিলের দুধারে বসে ছিল দুজন লোক। সময় রাত্রিকাল, অত্যধিক ঠাণ্ডা, টিমটিমে কেরোসিন আলোতে পরিবেশ হয়ে উঠেছিল প্রায় ভুতড়ে। ট্রেন সাংঘাতিক লেট, কখন আসবে কোন ঠিক নেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনে সেখানে বসে রয়েছে, বিরক্তিকর প্রতীক্ষা। ঘরের স্টোভ উত্তাপের চেয়ে গন্ধই ছড়াচ্ছিল সমধিক। বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা। কোথায় যেন টিনের চালের ওপর জল পড়ার একঘেয়ে শব্দ হচ্ছিল।

দুজন পরস্পরের অপরিচিত মানুষ অস্বাভাবিক ভাবে চুপচাপ বসে ছিল। বয়সে যে ছোট সে শহুরে যুবক, আলাপচারিতে অভ্যস্ত, সে কয়েকবার বিফল চেষ্টা করেছে আলাপ জমাবার সফল হয় নি বয়স্ক ব্যক্তির অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও বাকমিতব্যয়িতায়।

ছেলেটির বয়স্ক লোকটিকে কিছুটা অজব মনে হল। মাঝারি উচ্চতার ক্ষীণজীবী লোকটির গায়ে কালোরঙের ময়লা দীর্ঘ ওভার-কোট। ময়লা জুতোতে কাদা লেগে রয়েছে। কেমন যেন বিবর্ণ রঙহীন মুখ। নাকটি তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ, সরু ও দীর্ঘ চোয়াল। দুচোখের পাশ থেকে বেশ কয়েকটি বলিরেখা চলে গেছে গণ্ডপ্রদেশে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বাদামী রঙের ঘোলাটে দুটি চোখ। ঘোলাটে হলেও মাঝে মাঝে যেন জ্বলে উঠছিল তা। মাথায় পেছনে অস্বাভাবিক ভাবে একটা বোলার হ্যাট পরেছিল লোকটা।

সোজা ঋজুভাবে কাঠের চেয়ারে ধ্যানমগ্নের মত বসেছিল সে। সবক্ষণ দুটি হাত ওভারকোটের পকেটে ঢোকান। তরুণ ছেলেটি নানা বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে অপরপক্ষের রূঢ় ঔদাসীন্যের ধাক্কায় বারে বারেই থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ছেলেটির যে কথা না বললেই

নয়। চুপচাপ থাকাকে সে মৃত্যুর সামিল জ্ঞান করে তার যে অনেক কিছু বলবার রয়েছে সেগুলো পেটের মধ্যে যেন পাক খাচ্ছে, বেরিয়ে আসবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। মনে মনে এবার দৃঢ় সংকল্পিত হল। লোকটা কথা না বলে, সে নিজেই কথা বলে যাবে। ভীষণ এক ঘটনা ঘটে গেছে তার জীবনে। ভয়ংকর কাহিনী। শুনলেও যদি লোকটা বিচলিত না হয় বা কৌতূহলদীপ্ত না হয় তবে বুঝব লোকটা মানুষ নয়, পাষাণ হৃদয় এক জানোয়ার।

মরিয়া হয়ে ছেলেটি এবার কথা শুরু করলো, আপনি বলছিলেন না, যে আপনি একজন শিকারী মানুষ?

লোকটির দেহ এতটুকু নড়ল চড়ল না। শুধু নিষ্প্রভ চোখ দুটিতে কিছুটা যেন কৌতুকের ঝিলিক দেখা দিল। বেশ কয়েক সেকেণ্ড বাদে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে সে জবাব দিল, আমি এখানে শিকার করতে এসেছিলাম।

—তাহলে তো আপনি এ অঞ্চলের প্রখ্যাত লর্ড ফ্লিয়ারের কুকুর-বাহিনীর কথা শুনে থাকবেন।

—আমি জানি তাদের কথা।

—আমি সেখানেই বাস করে এলাম, তরুণটি বলে গেল, লর্ড ফ্লিয়ার হলেন আমার জ্যাঠামশাই।

বয়স্ক লোকটির কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হল না, শুধু ঠোঁটের কোণে ও নিষ্প্রভ চোখ দুটিতে প্রচ্ছন্ন হাসির ঝিলিক দেখা গেল। আবার চুপচাপ।

তরুণটি থামতে দিল না বললে, আমার জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারে একটা নতুন এবং উল্লেখযোগ্য গল্প শুনবেন দয়া করে? সংক্ষেপেই বলব, ব্যাপারটা ভীষণ রহস্যময়, শুনবেন কি?

কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে সেই ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠ বলে উঠল, শুনব।

—বেশ, বলে তরুণটি চেয়ারটাকে সামনের দিকে এগিয়ে এনে বাগিয়ে বসে সোৎসাহে শুরু করল:

বোধকরি আপনি শুনে থাকবেন আমার জ্যাঠা লর্ড ফ্লিয়ার

এখানে বিরাট এক ফার্মের মধ্যে বড় সাইজের এক দুর্গবিশেষ অট্টালিকায় স্বেচ্ছানির্বাসনের মত বাস করছেন। একপাল কুকুর, কিছু চাকর-বাকর নিয়ে নির্জন জীবন যাপন করছেন। আশেপাশের পড়শীদের সঙ্গেও তিনি মেলামেশা বা বাক্যালাপ করেন না। কিছু সম্পত্তির আয়, কিছু কিছু শিকার, আর ঘোড়ায় চড়ার নেশা নিয়ে সভ্যতা থেকে বেশ দূরে অদ্ভুত একক জীবন-যাপন করে চলেছেন।

জ্যাঠামশাই বিয়ে করেন নি। আমি তাঁর একমাত্র ভাইপো। অতএব তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হব এই আশায়ই আমি মানুষ হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধকালীন এক নতুন ব্যাপার হল। দেশের প্রতিটি নাগরিক যুদ্ধের এবং যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপারে কায়-মনোবাক্যে সহযোগিতা করে যাচ্ছিল একমাত্র আমার জ্যোঠামশাই ছাড়া। তিনি বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে-ছিলেন, এমনকি দৈনিক পত্রিকাও রাখতেন না রেডিও টেলিভিসন তো দূরস্থান।

এরপর আশেপাশের জনসাধারণের অনুরোধে হোক বা যে কোন কারণেই হোক তিনি বিদেশাগত একজন রেফুজিকে ভরণ-পোষণ করতে সম্মত হলেন।

অচিরেই এসে উঠলো একজন বেলজিয়াম-রেফুজী। কোন পুরুষ মানুষ নয়, দেশহারা এ হল একটি বধির মেয়ে। বয়েস পঁচিশ হল-থলে মোটা গড়ন, গায়ে একটু বেশী লোম, দেখতে বাজে। তার এক-মাত্র আনন্দ খাওয়াতে। রাক্ষসের মত প্রচুর খেত, প্রচুর ঘুমতো, বাড়ির বার হত না, সপ্তাহে একদিন স্নান করত আর বছরের পর বছর একটা মোটা বই নিয়ে বসে থাকত, পড়ত কিনা ঈশ্বর জানেন।

দেশাত্মবোধে গৃহে স্থান দেওয়া মেয়েটি কালক্রমে জ্যাঠামশাইর স্নেহধন্যা হল। যুদ্ধ শেষে অবশ্য বেলজিয়ামে ফিরে যাবার প্রশ্ন ছিল না। তবে আমি আতঙ্কিত চিত্তে শুনলাম যে ঐ কদর্য মোটা ধুমসো বিদেশিনীকে নাকি উইল পালটে জ্যাঠামশাই তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে যাবেন। ওকে পোষ্যকন্যা রূপে গ্রহণ করবেন।

চরম হতাশ হলেও আমি বাৎসরিক একবার করে এসে এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতাম। সারাদিনে দেখা হত না, শুধু খাওয়ার টেবিলে সেই কুৎসিত মেয়েটার সঙ্গে দেখা হত, আর বিষম বিরক্তিতে মন বিষিয়ে যেত। যাই হোক ব্যাপারটাকে প্রায় মানিয়ে নিয়েছিলাম।

এবার যেদিন এলাম এখানে সেদিন ডিনারের সময়ই লক্ষ্য করলাম জ্যাঠামশাইয়ের হাবভাব যেন খুবই চিন্তাগ্রস্ত। খাওয়ার পর তিনি আমাকে তার স্টাডিরুমে ডেকে নিয়ে গেলেন। ব্যাপার কি? আমি খানিকটা দুরুদুরু বক্ষেই গেলাম।

—পল, সুগম্ভীর গলায় জ্যাঠামশাই বললেন, আমি বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। গতকাল আমার একজন প্রজার দুটি ভেড়া মারা গেছে। রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে তাদের। সে বলছে কোন বন্যজন্তু মেরে ফেলেছে তাদের। কুকুরে মারলে ভেড়াদের কোণঠাসা করে সারা অঙ্গে কামড়ে খাবলে মেরে ফেলে। এটা তা হয় নি। প্রকাশ্য স্থানে এদের মৃত্যু হয়েছে। আমি নিজে দেখতে গিয়েছিলাম। ভেড়া দুটোর গলা যেন ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। আঁচড় কামড়ের কোন চিহ্ন নেই সে দেহে। যেই মেরে থাকুক সে খুবই শক্তিশালী জানোয়ার হবে। অথচ এ অঞ্চলে কোন বন্য হিংস্র জন্তু আদৌ নেই। আজ সকালে ফের আরেকটি নিহত হয়েছে ফার্মের অভ্যন্তরে এবং একই-ভাবে। আমরা আশেপাশের বনভূমিতে তল্লাসী করে কোন জন্তু-জানোয়ারের পদচিহ্ন পাইনি, পেয়েছি শুধু—

—কি পেয়েছেন?

—শুধু মানুষের পায়ের চিহ্ন, বলতে বলতে জ্যাঠামশাইয়ের চোখ ভাবনায় বিস্ফারিত হল সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারপ্লেসে একটা বিরাট জলন্ত কাঠ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। দুজনেই আমরা চমকে উঠলাম।

এরপর দুজনেই চুপচাপ হয়ে গেলাম। অসহনীয় নীরবতা নেমে এল স্টাডিরুমের সেই বদ্ধ আবহাওয়ায়। আমি ভেবে অবাক হলাম প্রজার তিনটে ভেড়া নিহত তা যে কারণেই হোক জ্যাঠামশায়ের তাতে এতটা ভাবিত হবার কি হল। অস্বাভাবিক হলেও এমন কিছু রহস্য-

জনক ব্যাপার হয়ত অচিরেই থাকবে না।

নিভন্ত পাইপে বৃথা কয়েকটা টান দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, বস পল। তোমায় তাহলে একটা ব্যাপার শোনাই।

এরপর যা বললেন তার সারাংশ হল, প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে তিনি তিরিশ বছর বয়সের একজন স্ত্রীলোককে এ দুর্গে পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করেছিলেন। গৃহকর্ম, সেবাশুশ্রূসায় খুবই পারদর্শিনী ছিল সে স্ত্রীলোকটি। স্বাভাবিক ভাবেই জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে।

সে ছিল সন্তান-সম্ভবা। দুর্গের এক দূরতম প্রকোষ্ঠে তার একটি একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নার্স ও সব কিছুর ব্যবস্থাই করেছিলেন লর্ড ফ্লিয়ার।

একজন নার্স এসে সংবাদ দিল সন্তান জন্ম দিয়ে স্ত্রীলোকটি মরণোন্মুখ হয়েছে। লর্ডের সঙ্গে সে শেষ দেখা করতে চায়। জ্যাঠা-মশাই চলে গেলেন দুর্গের সেই একান্ত প্রকোষ্ঠে।

স্ত্রীলোকটি কাঁদতে লাগলো মরণ শয্যায় শুয়ে। পরে শিশুটিকে লর্ডের সামনে আনতে বললে নার্সকে। নার্স সেই নবজাত শিশুকে আনতে স্ত্রীলোকটি যেন অন্তিম প্রার্থনা জানিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে, এ শিশুকে আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করবেন, কথা দিন। আমি ওকে সব বলে দিয়েছি. ও খুব ভাল ছেলে হয়ে উঠবে, আমি এই সন্তান গর্বে গর্বিত।...এই ধরনের প্রলাপোক্তি করতে করতে স্ত্রীলোকটি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। প্রলাপের মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠের এই শাসানিও ছিল যে এ ছেলেকে বঞ্চিত করে যে সম্পত্তি নেবার চেষ্টা করবে তাকে এ চরম প্রতিশোধ নিয়ে খতম করে ছাড়বে......

এবারে নার্স সেই সদ্যোজাত শিশুটির হাতের পাঞ্জা তুলে লর্ডকে দেখালো। লর্ড সেদিকে তাকিয়ে সভয়ে দেখলেন নবজাতকের তৃতীয় অঙ্গুলীটি দ্বিতীয়ের থেকে বেশ অনেকটা লম্বা...।

—এর তাৎপর্য তো বুঝলাম না, আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

—তাৎপর্য হল এই ধরনের আঙুল নিয়ে জন্মালে তারা কালক্রমে ওয়ার-উলভস্ হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের ধারণা।

—ওয়ার উলভস্ ব্যাপারটা কি?

—মানে হল মানুষ-নেকড়ে, মানবরূপী নেকড়ে, লর্ড ফ্রিয়ার অতি গম্ভীর কণ্ঠে বলে গেলেন, যে কোন কারণেই হোক এরা দিনে মানুষ থেকেও রাত্রিকালে নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ওয়ার উলভস্ এরা মানুষ মারে, জন্তু-জানোয়ার মারে এবং শোনা যায় বধ করে তাদের রক্ত পান করে। এদের নজর মানুষের প্রতিই বেশী। মধ্যযুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপে বিশেষ করে ফরাসী দেশে এদের খুবই প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। ডাকিনীদের মত এদেরও ধরে ফেললে মেরে ফেলা হত। পুরনো বই-পত্রেও এদের বিবরণ আমি পড়েছি।

—তারপর ঐ ছেলেটার কি হল? আমি জিগ্যেস করি।

—আমার গৃহরক্ষকদের একজনের স্ত্রী তাকে বছর দশ পর্যন্ত লালন-পালন করে, তারপর সে কোথায় যেন চলে যায়, একেবারে বেপাত্তা হয়ে। তারপর আর কোন সংবাদ পাইনি কতকাল। শুধু পেলাম গতকাল।

সহসা নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। আমি যেন এই ধরনের কাহিনী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আবার ভয়ও যে না পেয়েছিলাম কিছুটা এমন নয়।

—তাহলে, সেই ছেলেটাই মানে মানুষ নেকড়েটাই এইসব ভেড়াদের বধ করেছে বলে আপনার ধারণা?

—হ্যাঁ তাই। হাত পাকাচ্ছে এসব দিয়ে। ভেড়া মারাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

শুনে আমি ভয় পেলাম। মনে পড়লো স্ত্রীলোকটির মরণকালীন অভিশাপবাণী উচ্চারণের কথা। রক্ষে করো। আমি বেঁচে গেছি। একথা ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে আমি তো আর জ্যাঠার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নেই। উইল পালটে এখন হয়েছে ধুমসো সেই বেলজিয়াম

ে ফুক্সী বোবা মেয়েটা যার নাম জারমেইন।

—আমি জারমেইনকে সন্ধ্যার পর বাইরে বেরুতে নিষেধ করে দিয়েছি, লর্ড ক্লিয়ার বললো।

সত্যি কথা বলতে কি সে রাতে আমি ছুচোখের পাতা এক করতে পারিনি, আতঙ্কে আর নিদারুণ আশঙ্কায়। জানলাপথে অন্ধকার বনাঞ্চলের পানে তাকিয়ে আমার রাত কেটে গেছে। একবার মনে হল, স্বপ্নের ঘোরে, সঠিক জানি না, একবার যেন নেকড়ের গর্জনের মত একটা বিদঘুটে আওয়াজে চমকে উঠেছিলাম এক সময়। ঝরা পাতার উপর অস্ফুট পদধ্বনিও যেন কানে এসেছিল।

সকালে উঠে শুনলাম আরেকজন কৃষকের এক ভেড়া ছিন্নমুণ্ড হয়ে মারা পড়েছে। জ্যাঠামশাইর আদেশে আমরা প্রায় তিরিশজন মানুষ, কেউ পদব্রজে, কেউ ঘোড়ায় চেপে, কুকুরবাহিনী নিয়ে বনাঞ্চল তল্লাসী করতে বেরিয়ে পড়লাম।

শেষ ভেড়াটা যেখানে মারা পড়েছিল কুকুরটা সে জায়গায় ঘাস শুঁকে পরে চলতে লাগলো গন্ধকে অনুসরণ করে। কিন্তু রেল লাইন অবধি পৌঁছে তারা যেন দিশেহারা হয়ে গেল। শক্ত মাটিতে কোন মানুষের পায়ের চিহ্নও পাওয়া গেল না।

সারাদিন তল্লাসের উত্তেজনায় আমাদের গার্ডসমূহ বেশ শক্তই ছিল। কিন্তু সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে জ্যাঠামশাইর মনে চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমরা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বাড়ি মুখো করলাম।

ছুর্গের পেছনের ফটকের পথে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এমনি সময় এক কাণ্ড হল। ছুর্গের গেট থেকে ৩০০ গজ দূরে আমরা এমন সময় অকস্মাৎ আমাদের ঘোড়া ছুটো একই সঙ্গে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লো। ডানদিকের বৃক্ষশ্রেণীর পানে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি হেনে তারা কান খাড়া করে রইল। ব্যাপার কি?

জ্যাঠামশাইর কাছ থেকে কেমন একটা অদ্ভুত আর্তনাদের আওয়াজ বেরিয়ে এসে আবহাওয়াটাকে যেন ভয়াল করে তুললো। সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলোর অপর পাড় থেকে অর্থাৎ ছুর্গের সামনেকার

গেট-এর দিক থেকে। কি যেন একটা গর্জন করে উঠলো। খটখটে অট্টহাসির মত ঘৃণাই এক বিদিকিচ্ছিরি সে আওয়াজ। সে আওয়াজ যেন ঢেউ খেলানোর মত বাড়তে কমতে লাগলো তারপর সহসা নিস্তব্ধতা নেমে রাত্রির অন্ধকারে যেন আরও বিষিয়ে দিল।

লর্ড ফ্লিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকেই সেই বৃক্ষশ্রেণীব দিকে দৌড়লেন। আমরাও তার পিছু পিছু গেলাম গিয়ে একটা উন্মুক্ত স্থানে যে দৃশ্যে দেখলাম তাতে আমাদের রক্ত জল হয়ে গেল।

বেলজিয়াম রেফুজি মেয়ে জারমেইন বীভৎস ভাবে ঘাসের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আকাশ পানে ভয়াল দৃষ্টি হেনে, তার কণ্ঠ ছিঁড়ে ছুটুকরো হয়ে আছে... '

কাহিনী শেষ করে যুবকটি ওয়েটিংরুমের ঘরে এবার চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে নিয়ে চুপচাপ হয়ে গেল। স্টোভ জ্বলছে, উত্তাপের চেয়ে গন্ধ বেশী ছড়াচ্ছে, আবছা কেরোসিন আলোয় ঘরের পরিস্থিতি ভুতুড়ে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেজোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে অজ্ঞাত লোকটির পানে তাকিয়ে বললে, অবশ্য এটা একটা বুনো অবিশ্বাস্য গল্প মনে হবে, তবু বিশ্বাস করুন এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। তবে একটা কথা শুনে রাখুন যে জন্যে আমিও একটু চিন্তিত না হয়ে পারছি না। মানে ঐ বেলজিয়াম রেফুজি মেয়েটার মৃত্যুর পর জ্যাঠা-মশাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন আমিই হলাম।

অজ্ঞাত পরিচয় লোকটা হাসলো, শ্লথগতির হাসি। তবে নিষ্প্রভ নয়, তার বাদামী রঙের ঘোলাটে চোখ দুটি যেন সহসা উজ্জ্বল হল, জ্বলে উঠলো।

তার দীর্ঘ ও ময়লা ওভার-কোটের মধ্যে সমস্ত দেহটা যেন নড়ে-চড়ে উঠলো, সে যেন ফুলে ফেঁপে উঠছে। অকস্মাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

কেন যেন যুবকটির সারা দেহ মনে অব্যক্ত ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ খেলে গেল। সামনের লোকটার জ্বলে ওঠা চোখ দুটোর মধ্যে কি

যেন রয়েছে যা তীক্ষ্ণ তরবারির মত তার হৃদয়ে যেন সমূলে বসে যাচ্ছে। শরীরে সেই ঠাণ্ডার রাতেও ঘাম দেখা দিল। সর্ব শরীর যেন অবশ, নড়ন-চড়ন শক্তি রহিত হয়ে গেছে।

অজ্ঞাত লোকটার মৃদু হাসি এখন সর্ব মুখে ছড়িয়ে একটা বীভৎস আকৃতি দিচ্ছে। দাঁতগুলো কি বিচ্ছিরি। মানুষের অমন হিংস্র দংষ্ট্রা হয় নাকি। ওকি, ঠোঁটের কষ বেয়ে যে লালা গড়াচ্ছে।

অতি ধীরে সে ওভার-কোটের পকেট থেকে একটা হাত বের করলো, মাথা থেকে বোলার হ্যাটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। যুবকটি মরণ আতঙ্কে দেখলো সামনের লোকটার তৃতীয় আঙুলটা দ্বিতীয়ের চেয়ে অনেক বড়!

যুবকটির সারা অঙ্গ কাঁপছে। সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়েছে সে। আতঙ্কে অবশ হয়ে দেখতে পেল অজ্ঞাত মানুষটার মুখ ক্রমে নেকড়ের মত রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে...আর সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে তার দিকে...

দানব রোগের ভয়াল রূপ

'নতুন বিশ্ব' জয় করে এলেন কলম্বাস, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দেহভরা 'নতুন' এক রোগ। কথিত আছে, তাঁকে চরম অসুস্থ অবস্থায় জাহাজ থেকে পাঁজাকোলা করে নামানো হয় তীর ভূমিতে এবং কিছুকাল মধ্যে সেই কালান্তক রোগেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

শেষের সেখানেই শুরু। সেই ভয়ংকর ব্যাধি, যাকে তখন নাম দেওয়া হয়েছিল 'জার্মান-পক্স' রূপে, সারা ইউরোপকে তছনছ করে, দেড় কোটি আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণহরণ করেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে।

সেই ব্যাধি, সেই যৌন-ব্যাধি, আজ বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়ে তার প্রাপ্য ফসল সমানে তুলে নিয়ে চলেছে সর্বাধুনিক এক নামে। দেবভূম ভারতবর্ষে সে ব্যাধির প্রথম পদার্পণ হয় প্রখ্যাত নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁর সহচরদের সৌজন্যে।

১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে এ রোগের যে অকল্পনীয়, বীভৎস ও ভয়ংকর মহামারী ইয়োরোপকে প্রায় শেষ করে এনেছিল, সেখান থেকেই কাহিনী শুরু করা যাক :

চমৎকার বসন্তকাল। যে বসন্তের জন্য প্যারিস সে-ঋতুতে হয়ে ওঠে স্বর্গসম, সেই মনোরম আবহাওয়ায় দেখা গেল অদ্ভুত একদল মানুষের মিছিল চলেছে রাস্তা ধরে, পথচারীরা ভয়ে আতঙ্কে সে দৃশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেউ কেউ ওদের দেখে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে, কেউ কেউ অসহনীয় সে দৃশ্য দেখার চেয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

মিছিলকে সংযত রাখতে রাখতে চলেছে বর্শা ও তরবারিধারী অশ্বারোহী বেলিফ ক'জন। মিছিল থেকে ছত্রভঙ্গ বা পালানোর চেষ্টা

করা কিছু নর-নরীকে তরবারি ও বর্শার আঘাতে রক্তাক্ত দেহে ফিরিয়ে আনছে তারা মাঝে মাঝেই।

এ মিছিলে চলছিল প্রায় চার হাজারজন পুরুষ, নারী এমন কি কিছু শিশুও। এরা প্রত্যেকেই যৌন-রোগাক্রান্ত। বছরটা হল ভয়াবহ সেই ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ, যে বছরে ভয়ংকর সিফিলিস মহামারী কামানের গোলার মত বিস্ফোরিত হয়ে সারা ইয়োরোপ মহাদেশকে দাউ-দাউ করে জ্বালিয়ে তুলেছিল।

এই অশুভ বর্ষের পূর্বে পর্যন্ত এ রোগ ছিল সম্পূর্ণ অজানা ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে। মধ্যে মাঝে কিংবদন্তীর মত এ রোগের কথা শোনা যেত দূর দূরান্ত দেশ থেকে ঘুরে আসা নাবিক-পর্যটকদের মুখে। কিন্তু সে বছর এল শিয়রে শমন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নর-নারী বেঘোরে প্রাণ দিতে লাগলো এই নূতন-আসা কালব্যাধিতে।

অকস্মাৎ আক্রান্ত প্যারিস, মরণযন্ত্রণায় ধুঁকতে লাগলো এই আচমকা আঘাতে। সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট জারমেইন জেলাকে এই রোগাক্রান্ত মানুষদের নির্বাসনস্থান স্থির করে ফেললো। কোয়েরাস্টাইন এলাকা। আদেশজারী হল এই রোগী ও রোগিনীদের অবিলম্বে ঐ জেলায় গিয়ে বন্দীজীবন যাপন করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড।

চার হাজার লোকের এইটি হল সর্বাধুনিক মিছিল, যাদের ধরে পাকড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেণ্ট জারমেইনের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, যেখানে গিয়ে তারা অনাহারে অনিদ্রায় পচে গলে মৃত্যুবরণ করবে। নাৎসী বন্দী শিবিরের মত এখানে জীবিত ও মৃত মানুষদের একযোগে গাদিয়ে রাখা হতে লাগলো।

বড়জোর হাজার দুই লোক বাস করতে পারে কোন মতে এমন এক স্থানে বিশহাজার নর-নারীকে বন্দী করে রাখা হল। মাঝে মধ্যে একটা ওয়াগনে করে কতগুলো পোকা-কাটা সব্জী দেয়ালের বাইরে থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত ভেতরে। তিন-চার দিন অন্তর এই জঘন্য-ও নগণ্য খাদ্য ছুঁড়ে দেওয়া হত পশুর অধম হতভাগ্য সেই নর-নারীদের। রোগের জ্বালায় আর অনাহারে অচিরেই খতম হতে

থাকলোএকের পর এক।

মিছিলটা যখন সিন নদীর একটা ব্রিজের কাছে পৌঁছেছে, জনৈক কৃষক যুবক, যার সর্বমুখে সিফিলিসের দগদগে ঘা, অকস্মাৎ লাইন থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে গেল ব্রীজের রেলিং-এর উপর। তারপর আর্তনাদের মত সচিৎকারে সে বলে গেল, সেণ্ট জারমেইনে গিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর চেয়ে এখানেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া আমি ঢের ভাল মনে করি। এই যে 'জার্মান-পক্স'-এ আক্রান্ত হয়েছি, এটা আমার দোষে নয়। এটা দিয়েছে আমায় ঐ ব্লু-বোর-ট্যাভার্ন মদ্যশালার বেশ্যাটা। হায়, আমি আমার বউ ছেলে মেয়েদের আর দেখতে পাবো না এ জীবনে।

রেলিং-এর ওপর সে ইতস্ততঃ করছিল ঝাঁপ দেবে বলে কিন্তু ইতি-পূর্বেই একজন সৈনিকের তীক্ষ্ণ বর্শা তার বুক ভেদ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ নদীর জলে ঝপাং শব্দে পড়ে মিলিয়ে গেল। মিছিল চলতে লাগলো।

প্যারিসের অন্যত্র তখন গির্জাগুলি থেকে মুহুর্মুহু ভয়াবহ ঘণ্টাধ্বনি বেজে চলেছে। ভীত সন্ত্রস্ত কিছু মানুষ রাস্তায় রাস্তায় বাছুরের রক্ত ছেটাচ্ছে, অনেকেই ধূপধুনা জ্বেলে বায়ু শুদ্ধ করছে, কেউ কেউ শয়তানের পূজা করে চলেছে, যাতে করে মানব-জাতির এ চরম সর্বনাশ রুদ্ধ হয়, অপসারিত হয়। এই নিদারুণ রোগ মোটামুটি ধাতস্থ ও প্রশমিত হওয়ার পূর্বে পরবর্তী পাক্কা তিরিশ বছরে আড়াই কোটি লোকের প্রাণ নিয়ে নিল, সমসংখ্যক বা তারও বেশী মানুষকে চরম বিকলাঙ্গ করে ছাড়লো। আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়াব্যাপী মানবজাতির মধ্যে কায়েমিরূপে আসন গ্রহণ করে অদ্যাপি তার মারাত্মক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বিউবনিক প্লেগ-এর মত এ যৌনরোগের সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর সে করাল রূপ আর নেই, এখন অনেক অনেক ঝিমিয়ে স্তিমিতরূপে ধিকিধিক প্রজ্বলিত হয়ে রয়েছে মাত্র।

১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ইয়োরোপে এ-রোগ ছিল অজ্ঞাত। শোনা

যেত মধ্যপ্রাচ্যে আছে, পরে প্রমাণিত হল 'নতুন বিশ্ব' বা আমেরিকায় এ-রোগ ভালভাবেই ছিল। কিন্তু সে বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই বিচিত্র ও ভয়ংকর রোগের প্রকোপ দেখা দিল ইয়োরোপে। অজস্র নর-নারী মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগলো আচমকা। রোগটা এতই নতুন যে তখন পর্যন্ত এর কোন নামকরণ করাই সম্ভব হল না।

রয়েল স্প্যানিশ কোর্ট-এর রাই ছ আইসলা নামক জনৈক রাজ-বৈদ্য ক্রিস্টফার কলম্বাস ও তার নাবিকদের চিকিৎসা করেন। তাঁরা তাঁদের চাঞ্চল্যকর আমেরিকা আবিষ্কার করে স্পেনে ফিরে এসেছেন এবং সঙ্গে করে এনেছেন দেহভরে অদ্ভুত এক রোগ যার বহিরাকৃতি যেমন বীভৎস, দ্রুত ক্ষয়রোগ হিসাবেও যেটা সমধিক কুখ্যাত। পরে জানা গেল যে কলম্বাস ও তার সহচরেরা রেড ইণ্ডিয়ান নারী সংসর্গে এই কুৎসিত যৌন রোগটি সংগ্রহ করে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সার্জেন জেনারেল ডাঃ থমাস পারান-এর মতে এই মহান আবিষ্কারককে জাহাজ থেকে বহন করে নামানো হয়েছিল স্পেনের মাটিতে গুরুতর এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়।

ডাঃ পারান তাঁর ভি ডি সম্পর্কীত পুস্তকের একস্থানে লিখেছেন: কলম্বাসের বুক থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত শোথ ও উদরীর মত হয়ে গিয়েছিল, যেমন হয়ে থাকে হার্টের ভ্যালভ জখম হলে, হাত-পা প্যারালিসিসগ্রস্ত, এমন কি মস্তিষ্কও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল—এ সবই কালান্তক সিফিলিস রোগের শেষ উপসর্গ। ফলে এই মহান আবিষ্কারক ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মে দেহত্যাগ করেন।

কলম্বাসের মৃত্যুর আগেই তাঁদের আনা এই বিচিত্র রোগটি ঝটিকাগতিতে ইয়োরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দু'বছর দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়োরোপের ওপর জ্বলন্ত ত্রাশের কাজ করে পরে ঢুকলো গিয়ে ইতালীতে। ফরাসী সম্রাট্ অষ্টম চার্লস নেপল্‌স্-এর সিংহাসন দাবি করে ইতালীয় উপদ্বীপে সসৈন্যে আক্রমণ চালান। তাঁর সেই পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য এ রোগটি ছড়িয়ে দেয় ঐ দেশে।

তদানীন্তন ইতালী ছিল বহু পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। প্রতিরোধকারী স্পেনীয় ও নেপল্‌স্‌ সৈন্যরা পালিয়ে যাবার পর সেইসব রাষ্ট্রে বিজিত সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাদর স্বাগত জানালো চরম চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে। আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল জার্মান, সুইস্‌, অষ্ট্রিয়ান, ইংরেজ এবং ওলন্দাজ সেনা, তারা চরম লুব্ধভাবে মুফৎ মদ ও সুন্দরী যুবতীনারী গোগ্রাসে গিলতে লাগলো এবং সেইসব নারীদের অধিকাংশই ছিল কলম্বাসের লোকেদের দ্বারা রোগসংক্রামিত, ফলে বিপুল সৈন্যবাহিনী রোগকবলিত হয়ে পড়লো অচিরাৎ।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা চার্লস-এর সেনাদল এই অজ্ঞাত অদ্ভুত রোগে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। তখন একে বিবিধ নামে অভিহিত করা হত, যেমন, টার্কিশ পক্স, ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান মিজল্‌স্‌, জার্মান পক্স, ফ্রেঞ্চ কার্স। প্রতিটি দেশ একে অপরকে এ রোগের অভিশাপের জন্য দায়ী করতে লাগলো, দোষারোপ করতে থাকলো।

এই রোগের মহামারীতে যখন তার সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত এবং আধা মৃত তখন ভীত চার্লস্‌ সংবাদ পেলেন তাঁকে নাকি হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ইতালী থেকে সৈন্যাপসারণের ঝটিতি আদেশ দিলেন। এবং সেই সব বারো জাতির দ্বারা গঠিত সৈন্যদল স্ব স্ব দেশে ছড়াতে লাগলো এই কদর্য রোগ। কোন দেশ অব্যাহতি পেল না, বিশালকায় রাশিয়া থেকে ক্ষুদ্রাদপি সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত যাবতীয় দেশ এ রোগের কামড়ে জর্জরিত হল।

প্রবলভাবে ভি. ডি. ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিটি নগরীতে প্রতিটি হ্যামলেট-এ সে আতঙ্কের তুলনা রইল না। গির্জার উপাসনা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অনিশ্চিতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ভীত জেনারেলরা সম্পূর্ণ সেনাদলকে ভেঙে দিল। ডাক্তারেরা, সে প্রকৃত বা হাতুড়ে যেই হোক না কেন উলটোপালটা মলম ও বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করে (যেগুলো এই রোগ প্রতিরোধে বা নিরাময়ে কোন কাজেই লাগতো না) রাতারাতি প্রচুর পয়সা উপার্জন করে বড়লোক হয়ে গেল।

ভি ডি যখন দেশকে তুরমুজ করে ফেলছে সে সময় হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা দোকান-পসার বন্ধ করে দিল। দেশের রেভেনিউ কমে যাওয়ায় নেদারল্যাণ্ডরাজ এক 'পক্স-ট্যাক্স' বসিয়ে দিল। হতভাগ্য যে নর-নারী বা যুবকগণ এ রোগে আক্রান্ত হবে তাকেই মাথাপিছু সরকারকে ৫০ গিলডার করে কর দিতে হবে, অন্যথায় কারাদণ্ড তথা মৃত্যুদণ্ড। একটিমাত্র সপ্তাহে আমস্টারডামে ৪৫০ জন হল্যাণ্ডবাসী কর না দিতে সক্ষম হওয়ায় ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিল।

সেই অবিশ্বাস্য বছরের যত দিন যেতে লাগলো ইয়োরোপে সাধারণ সমাবেশ বন্ধ হয়ে গেল, সৈনিকরা লড়াই করতে অস্বীকার করলো, গণিকালয় বন্ধ করে পুড়িয়ে দেয়া হল, থিয়েটার লোকশূন্য হওয়ায় দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

লিয়র প্রখ্যাত মেলার উদ্যোক্তারা ভি. ডি.'র ভয় সত্ত্বেও লাভজনক মেলা বন্ধ করতে অস্বীকার করে সশস্ত্র প্রহরী রাখলো যাতে মেলা-প্রাঙ্গণে নষ্ট চরিত্রের কোন নারী বা গণিকারা প্রবেশ না করতে পারে। গণিকারা প্রমাদ গনলো বছরের এই তিন মাসে তাদের মোটা রোজগার হয়, তা দিয়ে চলে বাকী নয় মাস। খেপে গিয়ে তারা দলবদ্ধ আক্রমণে পনের জন প্রহরীকে পর্যুদস্ত করে মেলায় ঢুকে গেল।

সেনাদল ডাকা হল। পরস্পর লড়াইয়ে রোগে ইতিমধ্যেই ক্ষতবিক্ষত জনা ত্রিশেক গণিকা নিহত হয়ে গেল সেখানে। এই ঘটনার ফলে ফরাসী দেশে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হল জনসমাবেশ, থিয়েটারসমূহ, যাবতীয় গির্জা, আদালত ও মুরগীর লড়াই। ১৪৪ ধারার মত অনধিক চার ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ হল। স্কুলে কোন ছাত্র রইল না, রইল না জেলের মধ্যে কোন বন্দী।

অথচ কেউ কোন কারণ খুঁজে পেল না এই প্রবল বন্যার মত ঐ বিদঘুটে রোগের প্লাবন কেন এসে সব দেশকে ক্রমান্বয়ে শেষ করে ফেলছে।

ডাঃ পারান বলেন, প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বলেই হোক বা সেই

যুগের সর্বপ্রথম আক্রমণের প্রবলতার জন্যেই হোক, এই রোগটি সাংঘাতিক মারকরূপে দেখা দিয়েছিল তখন। আজ কিন্তু এ রোগের সেই ধরনের হিংস্রভাব আর নেই, বহুলাংশে নিস্তেজ হয়ে গেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের চরম উন্নতিতে, সর্বাধুনিক ঔষধের জাদুগুণে এর মারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

সে যুগে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রবল জ্বর হত, দারুণ প্রলাপ, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং প্রতিটি হাড়ে বেদনা ও ঘা, ভয়াবহ চামড়া-ক্ষত দেখা দিত। চতুর্দিকে মৃত্যুর হাহাকার, এবং সাধারণ সর্দির চেয়েও বেশী সংক্রামক ছিল এই যৌন-রোগটি। যৌন-সংযোগ ছাড়াও, আজকের যুগে অভাবনীয়, সে যুগের সর্বস্তরের মানুষের ঘনিষ্ঠ জীবনধারাতেও এ রোগ সংক্রামিত হত।

এ রোগ প্রাদুর্ভাবের কয়েক মাসের মধ্যে আরব বণিকরা আক্রান্ত দেশসমূহে পারদঘটিত মলম পাঠাতে লাগলো। এ রোগের ঘা ইত্যাদি নিরাময়ে আরব চিকিৎসকগণ নাকি মার্কারী চিকিৎসায় ফল পেয়েছিল। কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি রোগ সারাবার কু-প্রচেষ্টায় ইয়োরোপের হাতুড়ে ডাক্তারেরা রোগীদের এত বেশী পরিমাণে সে ঔষধ দিতে লাগলো যে ওভার ডোজের ফলে হাজারে হাজারে রোগীর পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটলো।

যদিও সে যুগের ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদের এ রোগের কারণ সম্পর্কে ঝাপসা ধারণা ছিল, তবে এটা যে যৌন-সংযোগের ফলে সংক্রামিত হয় এ সন্দেহটা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে উঠলো।

জেনা নগরের এলবার্ট ভন টুইয়েস নামক একজন চক্ষু-চিকিৎসক ঘোষণা করলেন যে মাইক্রোস্কোপে সিফিলিসাক্রান্তর রক্ত রেখে তিনি "লিটল মনস্টার" কিছু লক্ষ্য করেছেন।

তিনি বললেন, এই সব অতি ক্ষুদ্র কীট বা বীজাণুগুলিই ঐ অভিশপ্ত ফরাসী পক্স রোগের হয়ত কারণ।

ভন টুইয়েস একজন কালদর্শী বিজ্ঞানী ছিলেন। যা হয়ে থাকে, তাকেও স্থানীয় নাগরিকরা জাদুকর বা ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান রূপে

অভিহিত করত।

একদিন জেনার নাগরিক কমিটির একদল মানুষ, যারা এই বিজ্ঞানী দর্শিত কর্কশ রুক্ষ আকৃতির "মনস্টার"কে নানাভাবে বিদ্রূপ করে এসেছে, তারাই সদলে হামলা করে এক রাত্রে শুধু ভন টুইয়েস-এর লেবরেটরী, সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করেই নিবৃত্ত হল না, স্বয়ং বিজ্ঞানীকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেললো।

হাতুড়েদেরও যেমন পোয়া বারো তেমনি তখনকার কজন জ্যোতিষীরাও ঘোষণা করলে সিফিলিস-মহামারীর জন্য কয়েকটি 'স্টার'ই দায়ী।

হেনরিখ উলবার নামক জনৈক প্রভাবশালী নক্ষত্র-বিজ্ঞানী রায় দিলেন, যাজকবৃন্দ এরোগে আক্রান্ত হয় বৃশ্চিক বা অপর কোন অশুভ লগ্নের নক্ষত্রালোকে অনাবৃত অবস্থা থেকে। আর আমাদের মধ্যেকার সাধারণ পাপাত্মার ডেভিল পক্স রোগে পড়ে নারীসংসর্গ মারফৎ।

উলবার নিজে এই রোগের প্রতিষেধকরূপী দুটি বিচিত্র বস্তু বিক্রি করে প্রভূত বিত্তশালী হয়ে ওঠে, এবং রাইন নদীর তীরে বিরাট এক এস্টেট ও একটি ক্যাসল ক্রয় করে। বস্তু দুটি হল . একটি মলম ও একটি সিল্কের মুখোশ ! এই দুটি বস্তু যদি কোন নিদ্রিত নর বা নারীর মুখে লেপন ও ঢাকা দেওয়া যায় তবে নাকি উক্ত ভি ডি জীবাণু দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মজা এই, এই পয়ত্রিশ বছর বয়স্ক শয়তান লম্পট নিজেই কাম-লালসায় নিমজ্জিত হয়ে ফরাসী এক গণিকাকে নিয়ে ভেনিসে গিয়ে স্ফূর্তিতে মত্ত রইল। যখন সে দেশে ফিরলো তখন সিফিলিসের ঘায়ে তার মুখের অর্ধেকটা বিকৃত হয়ে গেছে। ভয়াবহ সে দৃশ্য। এক কালের সম্মানীয় ব্যক্তি অতীব ঘৃণিত মানুষে পর্যবসিত হল।

অচিরেই জ্যোতিষী সাহেব গ্রেপ্তার হয়ে ফ্রাঙ্কফুটের শহরতলীর বন্দীনিবাসে আটক হয়ে পাঁচ সপ্তাহ বাদে অনাহারে সেখানে মারা গেল।

দ্রুত সঞ্চরণশীল এই রোগ নানা ধরনের পথে সংক্রামিত হতে

লাগলো নির্দোষ মানুষজনের মধ্যে। ধাত্রীদের মারফৎ আক্রান্ত হল গর্ভবতী মেয়েরা, নাপিতরা তাদের বিষাক্ত ক্ষুরমারফৎ এ রোগ চালান করলো অগণিত নিরীহ মানুষদের মধ্যে। বহু নগরে বন্দরে ব্যক্তিরা রোগাক্রান্ত হয়ে বিকৃত হবার বা মরবার পূর্বে শেষ স্ফূর্তি করবার মানসে গণিকালয়ে ঘুরে ঘুরে দিবারাত্র নিজের শেষ সুখ ও অপরের অশেষ অসুখ ফিরি করে যেতে লাগলো। নিজেরা তাদের কাছ থেকে অসুখ বাধিয়ে স্ব স্ব গৃহে স্ত্রীদের মধ্যে রোগ বিস্তার করে দিল। এই ভাবে মহামারী ক্রমে ক্রমে চরম পর্যায়ে উপনীত হল।

এই অজ্ঞাত রোগের নামকরণ করেন জিরালামো ফ্র্যাঙ্কাস্টোরো নামক জনৈক ইতালীয় ডাক্তার। তিনি নিওবের দ্বিতীয় পুত্র রোগাক্রান্ত সিফাইলাসের নামানুসারে এই নিদারুণ যৌনরোগটির নাম দেন : সিফিলিস। অদ্যাপি এই নামই বলবৎ রয়েছে।

সর্বস্তরের নরনারীর মধ্যে এই রোগের আতঙ্ক নিঃসীম পর্যায়ে উঠলো। কি ধনী কি দরিদ্র, কি সৈনিক কি করণিক, কি অভিজাত কি ছোট দোকানী, কি বেশ্যা কি বা অভিজাত বংশীয়া মহিলা, প্রত্যেকেই থরহরি কাঁপতে লাগলো রোগাক্রমণভীতিতে। ব্যাভেরিয়ান সম্রাট স্বয়ং ম্যাক্সিমিলান পর্যন্ত এমন আতঙ্কিত হয়ে গেলেন যে ১৪৯৫-এর ৭ই আগস্ট এক আদেশজারী করে ঘোষণা করলেন যে "পক্স রোগাক্রান্ত প্রতিটি মানুষকে কুষ্ঠ-রোগীদের মত ব্যবহার করে, তাদের অবস্থানুসারে এক হয় ফাঁসি দেওয়া হবে, নয়ত পুড়িয়ে মারা হবে কিংবা নির্যাতন করা হবে। তবে পবিত্র স্যাবাথ (রবিবার) দিনটাকে বাদ দিয়েই এসব করা হবে।"

দক্ষিণ জার্মানীর অল্প ক্ষমতাশালী কিছু প্রিন্স এমন আদেশও দিলেন যে প্রত্যেক রোগীকে রক্তবর্ণ পোশাক ও হাতে একটি শ্বেত-পতাকা বহন করে পথে বেরুতে হবে যাতে করে সুস্থ মানুষেরা তাদের সিফিলিটেক বলে চিনতে পেরে সভয়ে দূরে যেতে সক্ষম হয়।

সে যুগের দৃশ্যাদি এমনই হৃদয়বিদারক ছিল যে মহান আর্টিস্ট আলব্রেখট ডুরার এক উডকাট-এ সে দৃশ্য ধরে রাখেন, আজও যে

কাঠ খোদাই শিল্পকর্মটি "দি ফাস্ট' সিফিলিটিক" নামে প্রখ্যাত হয়ে আছে। বার্লিনের ক্রায়েডরিখ উইলহেলম মিউজিয়ামের দেয়ালে এটিকে দেখে আজও দর্শকবৃন্দ ভয়ে আতঙ্কে অবশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ আজ এ রোগ জাদু ঔষধ পেনিসিলিনের কল্যাণে কত না অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছে।

বর্দো থেকে যাওয়া বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকদের ব্রিস্টল বন্দরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সেই অশুভ বৎসরে ইংলণ্ডে এই বিভীষিকা রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে। দেড় মাসের মধ্যে চার হাজার নাবিক ও শহরের জনসাধারণ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ৪৭টি গণিকালয় সম্পন্ন নারকীয় বন্দর রূপে খ্যাত ব্রিস্টল নগরী এ ব্যাপারে স্বদেশকে খুব ভাল ভাবেই সাহায্য করলো ভি. ডি সম্প্রসারণে।

রোগটি লাফিয়ে লাফিয়ে ছেয়ে ফেললো দেশ। একলাফে গেল স্কটল্যাণ্ডে। সেখানকার রাজা চতুর্থ জেমস গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের হাতুড়ে ডাক্তার বনে গেলেন। সিফিলিস রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। এমন কি অনিচ্ছুক রোগীদের নিজ চিকিৎসাধীনে আনবার জন্য উলটে স্বর্ণমুদ্রা প্রদানও করতে থাকলেন। তার হাতুড়ে আজব চিকিৎসার একটি প্রিয় প্রক্রিয়া ছিল কালো ভেড়ার ফুটন্ত চর্বি ভি ডি রোগীর অঙ্গে লেপন করে দেওয়া।

সেই ভয়ংকর বছরের ৬ই নভেম্বরের রাজা জেমস্ এই আদেশ জারী করলেন যে তার যে সব প্রজা 'গ্র্যান্টগোর' রোগে (সিফিলিসের উক্ত নাম দিয়েছিলেন তিনি) আক্রান্ত হয়েছে তারা যেন অবিলম্বে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে তাদের স্ব স্ব শহর বন্দর পরিত্যাগ করে চলে যায়। অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড।

এই সব অসহায় মানুষগুলিকে (যার মধ্যে দশ বছরের শিশুও ছিল) স্কটিশ শহর লীথ-এর বিপরীতে এক দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে শুরু হল সপারিষদ হাতুড়ে সমেত স্বয়ং রাজা জেমস্-এর আজব চিকিৎসা। এরপর যখন পূর্বোক্ত 'ভেড়া চর্বি লেপন' চিকিৎসা

পদ্ধতি রোগ নিরাময়ে কোন কাজে এল না তখন মেগ হ্যারিকাট নামক এক দুর্বৃত্ত শয়তানের পরামর্শে রাজা ডজনখানেক নর ও নারী রোগীর জিভ কেটে ফেলে দিলেন।

এই নিষ্ঠুর চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্য অচিরেই পরিত্যক্ত হল। এবার স্কটিশ রাজা আরেক নতুন আদেশ জারী করলেন। যাবতীয় ভি. ডি. রোগীদের দু গালে চিহ্নিত করা হবে, সাধারণ্যে চাবুক মারা হবে, পরে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পাঠানো হবে 'আইল অব সোর'-এ (বন্দীনিবাস দ্বীপকে এই নামেই অভিহিত করেছিলেন তিনি)।

তদানীন্তন যুগের নামকরা কবি উইলিয়ম ডানবার, রাজা জেমস্-এর এই আজগুবী ও নিষ্ফল চিকিৎসা পদ্ধতির প্রশংসা করে এক কবিতা লিখে ফেললেন। ফলে রাজার কাছ থেকে পারিতোষিক হিসাবে এক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা লাভ করলেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস স্বয়ং কবিপ্রবর প্রতিবেশীর এক সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে রোগ বাধিয়ে বসলেন। রাজা জেমস্ বিষম রেগে নিজহাতে লোহা গরম করে সভাকবির দুই গণ্ডে ছেকা লাগিয়ে দিয়ে সরাসরি ডানবারেক উক্ত দ্বীপে নির্বাসিত করলেন, সেখানে মাস পাঁচেক বাদে তিনি দেহরক্ষা করলেন।

হেনরিখস্ নামীয় জনৈক মধ্যযুগীয় প্যারিসের লেখনীতে পাই এই ভেনারেল পক্স-এর ভয়াবহ বর্ণনা: "এই পক্স বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান হবার পরই সেটা মস্তিষ্ক অধিকার করে সেখানে তার কায়েমী বাসা বাঁধতো। এটা মাথা ভেদ করতে পারত, ব্লাড ভেসলের ভেতর দিয়ে কানে প্রবেশ করে রোগীকে কালা করে ছাড়তো, কানে পোকার জন্ম দিত, নাকটাকে দিত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, গড়ে তুলতো নেত্রনালীর ঘা।

এটা দাঁতের দফা রফা করে মুখগহ্বরকে করে তুলতো পূতিগন্ধময় নরক। আলজিভ খসে যাওয়ায় কণ্ঠস্বর নষ্ট বা পক্ষাঘাত আক্রান্ত হতো। কোমর এবং হাঁটু অসার হয়ে পাদদ্বয় এমনভাবে বক্র হয়ে যেত যে রোগীর চলন ক্ষমতা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেত।"

আজকের গবেষকগণও স্বীকার করেন এ বর্ণনার যথার্থতা। সেই ভয়ংকর বছরের অস্বাভাবিক ধরনের তীব্র এই যৌন রোগের উপসর্গের উক্ত লেখক কর্তৃক বর্ণনা নিখুঁত একটি ক্লিনিকাল প্রতিচ্ছবি। এই ভয়ংকর হিংস্র রূপই সেই ১৪৯৫ এবং পরবর্তী তিন দশক ধরে সারা ইয়োরোপকে মুমূর্ষু করে ছেড়েছিল।

তদানীন্তন ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতিও ছিল অভাবনীয় নিষ্ঠুর। তারা রোগীর চোখের পাতা বিদ্ধ করতো, কপালের দু পাশ পুড়িয়ে দিত, কামানো তালু কেটে ব্লাড ভেসল্ উন্মোচিত করত, শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে কাঠ পুড়িয়ে জ্বলন্ত ছেঁকা দিত। রোগের চেয়ে চিকিৎসা ছিল আরও ভয়ংকর, তারপর দু হাতের শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণ করাতো, পুরুষাঙ্গে জোঁক বসাত। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই রোগীরা রক্তশূন্য হয়ে মারা যেত।

স্পেনদেশেও ঐ ১৪৯৫-এর আগে সিফিলিস ছিল পুরোপুরি অজ্ঞাত। কিন্তু সে বছর ১৮ই জুন তারিখে পাড়ুয়া ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসর নিক্কোলো সিলাসিও বার্সিলোনায় গিয়ে এই ফ্রেন্স্ কার্সের (এ নামই তিনি দিয়েছিলেন) ৩০০০ রোগী দেখতে পেলেন।

এই প্রফেসর উক্ত রোগ নিরাময়ের এক অভিনব এবং চরম বেদনাদায়ক পদ্ধতি প্রেসক্রাইব করলেন। তিনি রোগীর তালুতে গর্ত করে তাতে ধোঁয়া ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন ফুঁ দিয়ে। তাঁর মতে এই ধোঁয়া ক্রমান্বয়ে মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে যে অশুভ শ্লেষ্মার দ্বারা এ রোগ জন্মায়, তাকে উড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসবে, এবং অচিরেই রোগী রোগমুক্ত হয়ে যাবে।

এই চিকিৎসা-পদ্ধতি যখন ব্যর্থ হল তখন প্রফেসর এক বত্রিশ-ভাজা মলম তৈরী করলেন, তার মধ্যে মিড়, সেরুজ, লরেল বেবি, গঁদ, সঙ্গে দিলেন পোড়া সীসে লৌহ মরচে, ধূনা, তার্পিন তেল, ঝাউ তেল, চবি এবং ষাঁড়ের খুরের মেদ ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত মলম নিয়ে

তিনি ও তাঁর সহকারী রোগীর হাত, পা, কোমর প্রভৃতি স্থানে সমানে মালিশ করতে থাকলেন এবং নাভি-অঞ্চলেও আরেকটি কি বস্তুর প্রলেপ লাগাতে লাগলেন। তার কিছু কিছু পেশেন্ট সর্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় এই মলমের প্রলেপ সহ উত্তপ্ত চুল্লী সন্নিধানে পাকা তিরিশ দিন পর্যন্ত কাল কাটাতে বাধ্য হল। তারা যদি এই প্রবল উত্তাপ চিকিৎসান্তেও জীবিত থাকত তো তাদের রোগ নিরাময় হয়ে গেছে বলে ঘোষিত হত। অপরাপর কিছু রোগীকে ঘরে উনুন জ্বেলে একটি বিছানায় শুইয়ে তাদের গায়ে গোটা কয়েক কম্বল চাপা দিয়ে বিছানার তলায় খাটের স্প্রীং-এর নীচে জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে রেখে দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়া হত। সহজেই অনুমেয় এমত অবস্থায় বহু রোগী চিকিৎসার চেয়ে রোগে মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলে বিবেচনা করত, কেননা এ অসহনীয় বেদনাময় পদ্ধতি, যার দ্বারা কোন ফলই হত না, তাকে সভয়ে পরিহাস করে চলত।

এরপর বেপরোয়া কিছু চিকিৎসক ঘোষণা করলেন সিফিলিস সারাবার একমাত্র ঔষধ হল তথাকথিত 'পবিত্র-কাষ্ঠ' (লিগনাম স্যাংটাম)। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমস্টার-ডামের ডাক্তার উলরিচ ভ্যান হাটেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভি. ডি. রোগীকে যদি একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চল্লিশ দিন একমাত্র লিগনাম স্যাংটাম চোকলা ছাড়া কিছু খেতে না দিয়ে বন্দী করে রাখা যায় তবেই রোগী উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

ভ্যান হাটেন স্বয়ং এ রোগ বাধিয়ে বসলো ভেরোনা শহরের রাস্তায় ঘোরা এক গণিকা সম্ভোগে। তিনি নিজে উক্ত পবিত্র-কাষ্ঠ চোকলা ভক্ষণ পদ্ধতিতে 'সেল'-এ চল্লিশ দিন থেকে উপবাসে জীর্ণশীর্ণ চরম দুর্বল হয়েও অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, আমি সেরে গেছি। এই পবিত্র-কাষ্ঠের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। এ পবিত্র-কাষ্ঠ প্রকৃতই ম্যাজিক কাষ্ঠ!

ডাক্তারের এ উচ্ছ্বাস যে কত মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়ে গেল দুই সপ্তাহ পরে অনাহারজনিত জীবনী-শক্তি হ্রাস ও সিফিলিসের প্রচণ্ডতায়

তার মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই 'লিগনাম স্যাংটাম' চিকিৎসা পদ্ধতি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

সারা ইয়োরোপীয় রাজ্যের পৌর প্রতিনিধিরাই ঐ রোগীদের কোয়েরেন্টাইন পদ্ধতিতে বন্দী রেখে রোগ বিস্তার রোধে বিফল হল। বিদেশী আগন্তুকদের শহর বন্দর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তাদের ক্ষেত্র-বিশেষে পাথর মেরে বা প্রহারে জর্জরিত করে মেরে ফেলা হল। রুগ্ন পর্যটকদের নদীতে বা কুয়োতে ফেলে বধ করা হল। স্বদেশী নাগরিকরাও রোগাক্রান্ত হলে এর চেয়ে কিছু কম নিগৃহীত হল না।

পোল্যাণ্ডের ক্র্যাকাউ শহরের ক্রুদ্ধ গৃহিণীরা দল বেঁধে আক্রমণ করলো সেখানকার কুখ্যাত এক গণিকালয় (অন্তত এক বছর বন্ধ থাকবে মিউনিসিপ্যালিটির এই নির্দেশ উক্ত গণিকালয় অমান্য করেছিল), তারপর রান্নার তেল ঢেলে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। সে আগুনে পুড়ে মরলো ছজন গণিকা ও পাঁচজন খদ্দের পুরুষ।

ইওরোপে মধ্যে ভেনিস নগরীই সর্বাধিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এই জঘন্য ব্যাধিতে। ১৪৯৫-তে ওখানকার ৩ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ১১,৬৭৫ জন ছিল গণিকা। নানা প্রকার যৌন বিকৃতির খেলা চলতো সেই সব বেশ্যালয়ে, ফলে এ রোগও হু হু করে হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়লো সারা ভেনিস-এ।

গ্র্যাণ্ড ক্যানাল-এ প্যালাজজো দা মস্টোতে ভেনিসিয়ান প্রিন্সদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসে, কেন না সে সময়েই উক্ত জল-নগরীতে সর্বাধিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। সিফিলিসে মরা আট হাজার ভেনিসিয়ান নরনারীকে খালের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে মৃতদেহের দ্বারা আবহাওয়া দূষিত না হয়।

অভিজাত সম্প্রদায় ভুল করে ভাবলো যে সাধারণ নাগরিকদের শত হস্তেন দূরে রাখলেই এ রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব, তাই তারা তাদের প্যালেস এবং দুর্গসমূহ সদা সতর্ক প্রহরী দ্বারা ঘিরে রাখলো। তাদের দুর্গের খুব নিকটে আসা নৌকারোহীদের প্রতি জ্বলন্ত অগ্নিসহ তীর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করলো।

কিন্তু এই অভিজাত সম্প্রদায় ভেবে দেখলো না যে এই জার্মান পক্স রোগ তাদের স্বজাত অভিজাত রক্তের দ্বারাও সংক্রামিত হতে পারে। প্রাসাদের মধ্যে ভিড় করা বেশ কিছু প্রিন্স এই জঘন্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। কিভাবে তাহলে এল এই রোগ? এলো একটি পরিচারিকা মারফৎ। 'প্যালাজজো'তে উক্ত যুবতীকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল নিঃসঙ্গ প্রাসাদ বন্দী কিছু প্রিন্সদের মনোরঞ্জনার্থে, ফলে এই যুবতীই তার রাজকীয় প্রণয়ীদের এই রোগটি উপহার দেয়।

এক মাস বাদে দেখা গেল প্রাসাদের শরণার্থী ৩৫ জন প্রিন্সের মধ্যে মাত্র তিনজন রোগ এড়িয়ে তখনও জীবিত আছে।

বছরের শেষে ভেনিস নগরীর অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ালো। ১৭ হাজার লোক মৃত এবং ৪০ হাজার লোক রোগাক্রান্ত।

রোম নগরীর কুখ্যাত বরজিয়া বংশের গৃহচিকিৎসক ডাঃ ক্যাসপেয়ার টরেল্লা সখেদে তাঁর ডাইরীর এক স্থানে লিখেছেন যে একমাত্র ঐ কুখ্যাত পরিবারেই তিনি সতের জন নরনারীকে ভি ডি. রোগে ভুগতে দেখেন। সেই সতের জনের মধ্যে অচিরেই বারোজন মারা যায়।

রাশিয়াতে, আইভ্যান দি টেরিবল এই রোগের পাল্লায় পড়ে প্রাণত্যাগ করেন। ঐতিহাসিকদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ভি ডি-র ফলেই আইভান দুরন্ত রাগী ও হিংস্র হয়ে ওঠেন এবং সংখ্যাতীত নিরপরাধ নরনারীকে অবাধে নিধন করেন।

ইয়োরোপীয় বণিকগণ সাউথ সী অঞ্চলে এ রোগ নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ নাবিক সঙ্গ করে নেটিভ রমণীগণ আক্রান্ত হয়, কিছুকাল মধ্যেই দ্বীপের পর দ্বীপের পনেরো আনা জনসংখ্যা মৃত্যুকবলিত হয়ে যায়।

প্রখ্যাত অভিযাত্রী ভাস্কো-ডা-গামার নাবিকবৃন্দ, যারা পূর্বেই ইয়োরোপ থেকে রোগ বাধিয়ে ফেলে, তারা এই কালান্তক 'পক্স' বহন করে নিয়ে আসে ভারতবর্ষে। বিদেশী ও নতুন রোগ দুইয়েরই পদসঞ্চার হল ভাস্কো-ডা-গামার সৌজন্যে। ফরাসীদেশ ও জার্মানী

থেকে বিতাড়িত জিপসীরা এই রোগের বিভীষিকা কালক্রমে ছড়ালো অন্তত বারো চৌদ্দটি দেশের অজ পাড়াগাঁয়েও।

তবে পরবর্তী বছরের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এ ভয়ংকর রোগের প্রকোপ বহুলংশে তেজ হারিয়ে যেন স্তিমিত হয়ে পড়লো। মহামারী আর রইল না। অবশ্য পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে এ রোগ নিরবধি ধারায় সংক্রামিত হতে থাকলো ঠিকই, তবে ১৪৯৬-এর অকল্পনীয় ভয়াভয়তা আর রইল না। তবে এক বছরই কয়েকশ বছরের ট্যাক্স নিয়ে গেল। শুধু সেই কুখ্যাত বছরটিই ইয়োরোপ থেকে ঐ একটি মাত্র যৌনরোগ দেড়কোটি আবাল-বৃদ্ধ- বনিতাকে পরপারে চালান করে ছাড়লো।

তবে এ রোগ বুঝি অমর, তাই আজও এই 'পক্স' সারা বিশ্বব্যাপী রাজত্ব করে চলেছে অবাধ গতিতে।

নাৎসী ইউ-বোট

অ্যাডল্‌ফ হিটলারের মৃত্যু হয়েছে, নাৎসী জার্মানীর অবস্থাও টলমল। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরমায়ু আছে তার। •

ঠিক এমনি সময়ে মার্কিন উপকূল, ব্লক আইল্যাণ্ডের অদূরে সমুদ্র-বক্ষে নাক জাগালো একটি পেরিস্কোপ। কুখ্যাত নাৎসী সাবমেরিন ইউ—৮৫৩ থেকে ভেসে উঠলো পেরিস্কোপটি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে বিকেল। অদূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমেরিকার তীরভূমি। শুধু তীরভূমি নয় পেরিস্কোপের মধ্যে—আরেকটি বস্তুও ভেসে উঠেছে। একটি জাহাজ। কয়লাবাহী মার্কিন জাহাজ। ধীর গতিতে চলেছে কোন বন্দরের দিকে কে জানে।

নাৎসী সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন কার্ল স্নুল্‌ট্‌জের পেরিস্কোপে রাখা দৃষ্টি হিংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জাহাজটির দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। ১৮০০ গজ, ১৫০০ গজ। আশেপাশে তীরভূমি ব্যতীত আর কিছু নেই। এই সুযোগ। কয়লাবাহী জাহাজ 'ব্ল্যাক-পয়েন্ট' জানেও না যে সে সরাসরি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ক্যাপ্টেন স্নুল্‌ট্‌জের মনে পড়লো, কয়েক সপ্তাহ আগে দেওয়া গ্র্যাণ্ড অ্যাডমিরাল কার্ল ভোয়েনিট্‌জ-এর আদেশের কথা :

"মিত্রপক্ষীয় কোন জাহাজ আক্রমণ করবে না। আমেরিকার তীরভূমিতে নির্দিষ্ট তারিখে রাত্রি ১১টার সময় দুজন জার্মান এজেন্ট-এর সঙ্গে সংযোগ করতে হবে। তারা সাবমেরিনটির জন্য এক নির্জন উপকূলে অপেক্ষা করবে।

উক্ত উপকূলে সাবমেরিনটির অবশ্যই নিরাপদে পৌঁছনো বিশেষ জরুরী।" আমেরিকায় কার্যরত জার্মান এজেন্টদের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ আমেরিকান ডলার বহন করে চলেছে ইউ-বোটটি।

কিন্তু কয়লাবাহী জাহাজটি যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ক্যাপ্টেনের চোখ ততই হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। নিজ মনে নিজের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করলো সে। গ্র্যাণ্ড অ্যাডমিরালের উপরোক্ত আদেশ তার না মানলেও চলে। আদেশটি ছিল তার সিনিয়র অফিসার ক্যাপ্টেন লেফ্‌টেনান্ট হেলমুট সোমারের উপর। সে আর ইহ-জগতে নেই। এবং সোমারও কখনও তাকে ঐ রকম কোন আদেশ দিয়ে যায় নি।

দিন পাঁচেকের মধ্যে খোদ জার্মানী থেকেও কোন সংবাদ সে পায় নি। শেষ সংবাদ যা পেয়েছিল তাও সুখের নয়। রাশিয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণে বার্লিন প্রায় পৃথিবী থেকে মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে। শত্রু দ্রুত এগিয়ে আসছে রাজধানী দখলের উদ্দেশ্যে। অবশ্য রেডিওতে হিটলারের সুইসাইড সম্পর্কে কোন সংবাদ আসে নি। ক্যাপ্টেন জানে তাঁদের ফুয়েরার এখনও জীবিত এবং অচিরেই শত্রু পরাজিত করে বিশ্ববিজয়ী হবে!

—স্ট্যাণ্ড বাই টর্পেডো টিউবস ওয়ান, টু এ্যাণ্ড থ্রি, পেরিস্কোপে তীক্ষ্ণ নজর রেখে তিনি টর্পেডো ক্রুদের প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিলেন, টর্পেডো ছোঁড়বার জন্যে প্রস্তুত থাক। রেঞ্জ ১৩০০ গজ।

পেছন থেকে ভেসে এল টর্পেডো অফিসারের কণ্ঠ—'স্যার তীরের এত কাছাকাছি কোন টর্পেডো ছোড়া আমাদের তো বারণ আছে। বিশেষ করে যতক্ষণ না আমাদের কাজ হাসিল করতে ও মাল ডেলিভারী দিতে পারি—এখন তো এ কাজ হবে বিপজ্জনক। সুতরাং আদেশ মত—'

চীৎকার করে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন—যা বলছি শোন। আমার আদেশেই এখন কাজ চলবে। ভয়ের কিছু নেই। কয়লাবাহী জাহাজটা ছাড়া ত্রিসীমানায় আর কোন কিছু নেই।

'কিন্তু স্যার ঐ একটা পুরনো রদ্দি কয়লা জাহাজের জন্য দামী টর্পেডো নষ্ট করা'—

'কোন কথা নয়, যা বলছি পালন কর।'

টর্পেডো, সাবমেরিনকে ঝাঁকুনি দিয়ে বিদ্যুত গতিতে বেরিয়ে গেল নিশানার দিকে।

পেরিস্কোপে চোখ রেখে মনে মনে সেকেণ্ড গুনতে লাগলো ক্যাপ্টেন, তারপর টর্পেডোর আঘাতে কয়লাবাহী জাহাজটি যখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল, আত্মপ্রসাদের হা হা হাসিতে ফেটে পড়লো ক্যাপ্টেন সুল্ট্জে।

ঘড়ির দিকে চাইল, পাঁচটা কুড়ি। ক্যাপ্টেন-এর পক্ষে এ জীবনে জেনে যাওয়া সম্ভব হয় নি যে আর মাত্র ২৭ ঘণ্টা বাকি—তার পরই অজেয় জার্মান সৈন্যদল বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবে।

তন্মুহূর্তে সাবমেরিন নিয়ে ডুব দিল ক্যাপ্টেন। আর একটু সময় যদি ক্যাপ্টেন ভেসে থাকতো তাহলে পেরিস্কোপ মারফৎ তার নজরে পড়তো যে একটি যুগোশ্লাভ বাণিজ্য জাহাজ তাদের কিছুদূর পেছনে আসছে, যুগোশ্লাভ জাহাজ 'কামেন' পেরিস্কোপ দেখেছে। আর দেখেছে কয়লাবাহী জাহাজটির ডুবে যাওয়া। সে সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন উপকূল রক্ষীবাহিনীকে খবর করে দিল রেডিও মারফৎ।

উপকূল বেস্-এ তৎক্ষণাৎ সাড়া পড়ে গেল।

লেঃ কমাণ্ডার টলাকসেন বলে উঠলেন, 'বাজি রেখে বলতে পারি এ আর কেউ নয় সেই সাংঘাতিক সাবমেরিন ইউ—৮৫৩। এবার আর ওকে ছাড়া হবে না, ধরবোই ওকে, শেষ করবো ওকে, পালাবার তিনটি মাত্র পথ আছে—প্রতিটি পথ আটকাও। জলের তলায় ঘুপটি মেরে থাকলেও পরিত্রাণ পাবে না। এখানকার জল অগভীর। শালাকে এবার ডেপথ্ চার্জে শেষ করতে হবে।

'মবারলী' নামে একটি ডেস্ট্রয়ার ও 'অ্যাথারটন' ও 'অ্যামিক' নামে দুটি সাহায্যকারী জঙ্গী জাহাজ ছুটলো অকুস্থলের দিকে তীব্র গতিতে। জাহাজ ত্রয়ের প্রতিটি লোক ঘণ্টা দুই বাদে অকুস্থলের চতুর্দিক তোলপাড় করে তীক্ষ্ণ নজরে খুঁজতে লাগলো কালান্তক ইউ-বোটটিকে।

—নাৎসীরা নিশ্চয়ই যুগোশ্লাভ জাহাজের খবর পায় নি এবং

কাজে কাজেই আমাদের আসার খবরও পায় নি। সুতরাং ও ব্যাটা এই অগভীর সমুদ্রেই আছে এবং উত্তর দিকে অবশ্যই এগোচ্ছে।

এক মিনিট বাদে 'অ্যাথারটন' ইউ-বোটের সান্নিধ্য টের পেয়ে অপর দুটি জাহাজে খবর করল। সঙ্গে সঙ্গে নিকটে ছুটে এল তারা। ভাসলেই শেষ করে দেবে সাবমেরিনকে। বড় দুর্ধর্ষ ও সাংঘাতিক শত্রু ঐ সাবমেরিন।• গত এক বছরে সর্বসাকুল্যে ৬৫ হাজার টনেরও উপরে বাণিজ্য-জাহাজ ডুবিয়েছে সে। আক্রমণকারী দুটি ফাইটার প্লেনকে ধ্বংস করেছে। অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই দুর্মদ শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

যুদ্ধশেষের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ইউ—৮৫৩ই শেষ সাবমেরিন যে ফরাসী উপকূল থেকে সমুদ্র যাত্রা করে। জার্মানীর সুযোগ্যতম পাকা লোকের উপরই এটির ভার দিয়েছিলেন গ্র্যাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়নিট্‌জ। তার নাম সোমার। এই সোমার সর্ব সাকুল্যে আড়াই লক্ষ টন মিত্রপক্ষীয় জাহাজ ডুবিয়েছিল।

সোমার ও সুল্‌ট্‌জে এ দুজন বহুদিন ধরেই এক সঙ্গে কাজ করে আসছিল। যোগ্যতম জুটি। দুজনেই পড়াশোনার ভাণ করে যুদ্ধ পূর্বকালে আমেরিকা ও কানাডায় বহুদিন কাটিয়েছে। গোপনে উক্ত দেশগুলির সমস্ত উপকূল ভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিয়েছে। এদের মত দুঃসাহসী সাবমেরিন ক্যাপ্টেন ইতিহাসে আর জন্ম নেয় নি। ব্রিটিশদের এত সাংঘাতিক ক্ষতি এরা করেছিল যে সে সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ফরাসী ও বেলজিয়ামে তাদের এজেন্টদের কাছে সবিশেষ অনুরোধ করেছিল যে তারা যেন যে-কোন প্রকারে কোন্ সাবমেরিনে সোমার আছে তার সংবাদ সংগ্রহ করে এবং ইংরেজদের জানায়। এই লোকটিকে আমাদের চাই, তাতে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের কোস্টাল কম্যাণ্ডকে অ্যাডমিরালটি বলেছিলেন, সোমার ও সুল্‌ট্‌জের সংবাদ পেলে তন্মুহূর্তে সব কাজ ফেলে রেখে ওদের পেছনে ধাওয়া করবে, ওদের খতম করা চাই।

এদের একটি দুঃসাহসিকতম আক্রমণের ঘটনার উল্লেখ করলে বোঝা যাবে এরা ছিল কতদূর বেপরোয়া।

সেবার ৩০টি জাহাজের একটি কনভয় আমেরিকা থেকে নিরাপদে অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে এসে যখন আইরিশ উপকূলের মাত্র ৫০ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছে, এমন সময় সোমারের নজর পড়লো সেই দিকে।

ছ'টি ইউ-বোটের একদল থেকে বেরিয়ে এল সে। সঙ্গে সহকারী স্থুলট্জে। ডেস্ট্রয়ার ও সশস্ত্র ক্রুজারের পাহারা এড়িয়ে সে ঢুকবে কনভয়ের মধ্যে। সাংঘাতিক দুঃসাহস। ভেতরে চলছে তৈলবাহী ও খাদ্যবাহী কিছু জাহাজ। তাদের কাছাকাছি গিয়ে ভেসে উঠবে এই মতলব নিয়ে ডুব দিল সোমারের সাবমেরিন।

প্রায় ৩০০ ফুট জলের তলা দিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে সোমার তার ইউ-বোটকে চালিয়ে নিয়ে এলো কনভয়ের তলা দিয়ে। তারপর ৬০ ফুট তলায় উঠে এসে সহকারীকে বললে, 'মনে হয় আমরা কনভয়ের মাঝামাঝি পৌঁছেছি। এবার পেরিস্কোপের উচ্চতায় উঠব। অন্তত দুটো তৈলবাহীকে ঘায়েল করা চাই-ই।'

১০০০০ টনের তৈলবাহী জাহাজের আড়াই হাজার গজ দূরে পেরিস্কোপ তুললো সোমার! সামনে ৬০০০ টনের এক মাল জাহাজ তার পেছনে একটি তৈলবাহী তারও পেছনে আরেকটি তৈলবাহী জাহাজ! অবাক হল সোমার। এমন বোকার মত জাহাজ সাজায়! দুটো তৈলবাহী জাহাজ পর পর। সামনেরটাকে টর্পেডো মারলে সেই বিস্ফোরণেই তো পেছনেরটায় আগুন লেগে যাবে। ঠিক হ্যায়।

পেছনে আধমাইলের মধ্যেই আসছে একটি সশস্ত্র ক্রুজার তাতেও এতটুকু বিচলিত হল না সোমার! একটি টর্পেডো বাণিজ্য-পোতে, দুটি সামনের তৈলবাহী ও একটি পেছনের তৈলবাহী জাহাজে ছাড়া হল। তারপরই দিল ডুব। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তিনটি জাহাজই বিস্ফোরিত হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারগুলি অকুস্থলে এগিয়ে এসে যত্রতত্র পাগলের

মত ডেপথ-চার্জ মেরে চললো। সমুদ্র উথাল-পাথাল হতে থাকলো। ঠিক সেই সময়ে সোমারের সাবমেরিন ৩৩০ ফিট জলের তলায় নেমে ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপ করে এক স্থানে দাঁড়িয়ে রইল। ডেপথ-চার্জের রেঞ্জের বাইরে বসে ডেপথচার্জের ধাক্কায় আলোড়িত জলের দোলানিতে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সাবমেরিন। ত্বঘণ্টা এই ভাবে কাটবার পর সব চুপ হয়ে গেল। মনে হল হাল ছেড়ে দিয়ে ডেস্ট্রয়াররা চলে গেছে। কিন্তু অতি সাবধানী সোমার সেখান থেকে নড়ল না। পুরো সাত ঘণ্টা বাদে সে উঠে এলো সোজা ওপরে।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ যেখানে ভেসে উঠলো তার সামনেই দেখলো একটি মারচেণ্টম্যান জাহাজ চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে ডুব দিল কিন্তু জাহাজের গোলন্দাজরা ততক্ষণে দেখে ফেলেছে। ডেপথ-চার্জ ছাড়লো। যদিও সাবমেরিনের গায়ে সরাসরি আঘাত লাগল না তবু তার প্রচণ্ড ধাক্কায় প্রায় বিকল হয়ে সাবমোরিন জলের তলার দিকে তীব্র বেগে নেমে যেতে লাগলো। ১০০ ফুট যাবার পর ইঞ্জিনিয়ারগণ কোনমতে সাবমেরিনকে বাগে আনলো। কিন্তু ইতিমধ্যে ডেপথ-চার্জ কিঞ্চিৎ ক্ষতি করেছে তার। ব্যাটারী থেকে নির্গত ক্লোবিনগ্যাস বেরিয়ে অভ্যন্তরভাগ পূর্ণ হয়ে গেল। আশেপাশে ডেপথ-চার্জের বিস্ফোরণ হতে লাগলো। নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গ্যাস প্রবেশ করাতে নাবিকগণ কেশে মরতে লাগলো।

সোমার চীৎকার করে উঠলো, 'শিগগীর উপরে নিয়ে যাও সাব-মেরিনকে। নীচে থাকলে মরে যাব। উপরে গিয়ে না হয় লড়ব ব্রিটিশের সঙ্গে।'

বিপজ্জনক ও অবিশ্বাস্য ৫০ ডিগ্রী অ্যাংগলে সাবমেরিন ওপরে উঠে এল। এত জোরে উঠলো যে সামান্যর জন্যে মারচেণ্টম্যানের সঙ্গে ধাক্কা খেল না ঐ জাহাজের গোলন্দাজরা, প্রস্তুত হয়েই ছিল। সাবমেরিন ভাসতে কনিংটাওয়ারের দরজা খুলে মুক্ত বায়ুর জন্যে ডেকে উঠে এল নাবিকরা।

সোমার টর্পেডো মারবার জন্যে প্রস্তুত হল। ঐ জাহাজ থেকে

গোলা এসে বহু নাবিককে নিহত করলে। সাবমেরিনের থেকে বিশাল এক ফুটো হয়ে সমুদ্রজল ঢুকতে লাগলো। এই তুমুল গোলাগুলির মাঝখানেই সোমার দুটি টর্পেডো ছাড়লো মারচেন্টম্যানের দিকে—কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আশেপাশের সমুদ্র জঞ্জালে ও মৃতদেহে পূর্ণ হয়ে গেল।

স্থূলট্জে সাবমেরিন চালাবার আদেশ দিল।

সোমার বাধা দিল, বললে, 'দেখছ না কিছু ইংরেজী নাবিক জলে সাঁতার কাটছে আমরা জানোয়ারের বাচ্চা নই। হোক না যুদ্ধ হোক না ওরা শত্রু! এভাবে ওদের ফেলে গেলে তুষার শীতল জলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা মারা যাবে। তুলে নাও ওদের।'

'কিন্তু আমাদের এই জখমি সাবমেরিনে ওদের নিলে বেশী ভারী হয়ে যাবে না? তাছাড়া জলের তলায় ডুব দিতেও তো পারব না।

'তা হোক। যা বলছি শোন। ওদের তুলে নাও।'

সাতজন ইংরেজ নাবিককে তোলা হল। সোমার তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, 'আমরা ব্রেস্টবন্দর থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে রয়েছি। আমাদের সাবমেরিন সাংঘাতিক জখম হয়েছে। বন্দরে পৌছনো আমাদের পক্ষে দুরাশা। আমরা ডুবতে পারছি না। অথচ পথে শত্রুপক্ষের কারুর না কারুর নজরে পড়বেই—হয় প্লেন নয় জাহাজ। নিস্তার হয়ত পাব না, অবশ্য বাড়ি পৌছবার চেষ্টা আমি করবই এখন একটা উপকার তোমাদের করতে পারি রবারের নৌকা ও কিছু খাবার দিয়ে তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি। তবে তার পূর্বে কথা দিতে হবে যে যদি বেঁচে ফিরে যাও তো আমার সাবমেরিন যে কতদূর জখম হয়েছে সে সম্পর্কে কোন কথা প্রকাশ করবে না।

বন্দীদের মধ্যে অনেক তরুণ নাবিক এগিয়ে এল, বললে, 'আমার নাম লেফেটনেণ্ট ফরেস্ট স্যার, আমি রয়েল নেভাল ভলান্টিয়ার রিজার্ভ-এর অন্তর্ভুক্ত। বিটিশ তীরভূমি থেকে কত দূরে আমরা আছি স্যার?'

'এটুকু বলতে পারি যে তোমাদের উদ্ধার পাবার আশা খুবই ক্ষীণ,' সোমার বললে, 'যদি ইচ্ছে কর তো আমাদের সঙ্গে তোমাদের নিয়ে

যেতে পারি। অবশ্য তাতেও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেননা আমরা পরিত্রাণ পাব বলে আশা করি না।'

ফরেস্ট বিষণ্ণ হাসি হাসলো, বাঁ হাতে নাক থেকে বেরুনো কিছু রক্ত মুছে বললে, 'শুনে মনে হচ্ছে স্যার দুদিকেই মৃত্যু আমাদের অনিবার্য। তাই, যদি অনুমতি করেন স্যার, আমি বন্দীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি আমাদের আপনার সঙ্গেই যেতে দিন।'

ঘণ্টায় ৭ নট বেগে সাবমেরিন দিবারাত্র চলছিল। একটা মাত্র ডিজেল ইঞ্জিন চালু আছে। নাবিকরা ইতিমধ্যে ছোটখাট মেরামত করল সাবমেরিনে কিন্তু বড় ফুটো বন্ধ করবার মত উপায় তাদের ছিল না।

সোমার সাবমেরিনের ডেকে তিনটে বিমান-বিধ্বংসী কামান বসালো এবং একটা সাধারণ কামান ও গোলাগুলি মজুদ করে রাখলো।

ব্রেস্ট এর ৮০ মাইলের মধ্যে যখন তারা পৌঁছেছে, এমন সময় একটি হাডসন বিমান এগিয়ে এলো আক্রমণ করতে। পাইলটের ধারণা ছিল যে তাকে দেখামাত্র সাবমেরিনটি যথারীতি ডুব দেবে। তাই সে নির্ভয়ে ১০০ ফিট উচ্চতায় নেমে এল। সোমার প্রস্তুত ছিল। দুশো গজের মধ্যে আসতে কামান ছাড়লো। আর অমনি প্লেনটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু মুস্কিল হল নিয়মানুযায়ী কোন শত্রু সাবমেরিন দেখলে আক্রমণ করবার পূর্বে অবশ্যই হেডকোয়ার্টারকে জানাতে হবে। হাডসন বিমানটিও নিশ্চয়ই জানিয়েছে তা। সুতরাং শত্রু বিমানের ঝাঁক এল বলে।

বন্দীদের উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করে নি সোমার। তারা স্বাধীনভাবেই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল।

—সাবমেরিন ঘোরাও, আমরা পূবদিকে যাব, সোমার আদেশ দিলে। ১৮০ ডিগ্রী কোণে ঘুরলো ইউ-বোট। বড় বিপজ্জনক দিকেই যাচ্ছে সোমার। ডেনমার্কের দিকে। উদ্দেশ্য হল ডেনমার্ক

শত্রুকবলিত স্থান, সেদিকে গেলে ইংরেজরা টের পাবে না। তারা ভাবতেও পারবে না যে সাবমেরিনটি ডেনমার্কের দিকে যাবে। ইংরেজরা অধিকৃত ফরাসী উপকূলেই খোঁজ করবে ওদের। হলও তাই বোম্বারেরা গেল ফরাসী উপকূল অভিমুখে। কিন্তু একটি বোম্বার কি ভেবে এলো ডেনমার্কের দিকেই। এবং যথারীতি সাবমেরিনকে দেখতে পেল। প্রচণ্ড মেশিনগান চালিয়ে অনেককে নিহত করে ফেললো। কিন্তু সোমারের কামানের আঘাতে বিফল হয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেল।

নিজের ছোট কেবিনে ডেকে ইংরেজ বন্দীদের উদ্দেশ্য করে সোমার বললে, লোকেরা টের পেয়ে গেছে আমরা কোথায় আছি। বন্দরে পৌঁছতে এখনও আমাদের দুদিন সময় লাগবে। তবে আমরা সেখানে পৌঁছবার আশা রাখি না। কিন্তু একথাও ঠিক আমি কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ করব না। তাই তোমরা যদি চলে যেতে চাও তো আমি অনুমতি দিচ্ছি। আমাদের বাঁচবার কোন পথ নেই। আমি চোখের সামনে তোমাদের মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখতে চাই না। ছেড়ে দিচ্ছি এবং এখানো তোমাদের উদ্ধারেব আশা আছে। তবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ফিরে গিয়ে আমার সাবমেরিনের গতিপথ বা জখম সম্বন্ধে কিছুই বলবে না। রবারের নৌকো দিচ্ছি, সঙ্গে খাবারও দিচ্ছি।

সে রাত্রে ছোট ডিঙিতে তিন দিনের খাবার নিয়ে ইংরেজ বন্দীগণ সমুদ্রে ভাসলো। পরদিন বিকেলেই তাদের তুলে নিল একটি মিত্রপক্ষীয় জাহাজ।

কিন্তু আশ্চর্য, তরুণ লেফটেনান্ট ফরেস্ট তার কথা রাখলো। প্রশ্নের উত্তরে সে "সাবমেবিনটি জখম হয়েছে" শুধু এই একটি কথাই বলল, তাব বেশী কিছু বলতে সে অস্বীকৃত হল।

—জার্মান কমাণ্ডার অতিশয় ভদ্রব্যক্তি, তার কাছে আমি কথা দিয়েছি। সুতরাং এর বেশী কিছু বলব না। তিনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন, নৌকো দিয়েছেন, সঙ্গে খাদ্যও দিয়েছেন।

এদিকে ইউ-বোট গতিপথ পালটে ধীর গতিতে চলতে লাগলো। সৌভাগ্য তাদের, যে এরপর নেমে এল দুর্ভেদ্য কুয়াশা আর তীব্র ঝড়ো হাওয়া—যে আবহাওয়ায় প্লেন চালনা করা অসম্ভব। সুতরাং বিগত বিশ্বযুদ্ধের এক মাত্র উদাহরণস্বরূপ পরিত্রাণ পেল সোমারের সাবমেরিন। সে গিয়ে পরদিন উপস্থিত হল ব্রেস্ট বন্দরে।

১৯৪৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে সে শেষ যাত্রায় যায়। কিভাবে তা ঈশ্বর জানেন, সোমার বুঝি বুঝতে পেরেছিল যে সেটাই তার অন্তিম যাত্রা। হিটলারের দেওয়া প্রশংসাপত্র ও মেডেল ইত্যাদি সব কিছু সে খুলে বাড়ি রেখে যায়। প্রশ্নের জবাবে জানায়, পারিতোষিক ও পুরস্কারগুলি তার সঙ্গে সলিলসমাধি লাভ করে এটা নাকি সে চায় না। ছেলেপুলেরা বড় হয়ে তবু পিতাকে স্মরণ করবে এই সব দেখে গর্বিত হবে।

এটা ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা। মার্কিন দেশে জার্মান এজেন্টদের জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে যাচ্ছিল সে।

পথে ব্রিটিশ কেরিয়ার 'এনসিলাস' থেকে উঠে একটি সোর্ডফিশ বিমান সহসা আক্রমণ করে তার সাবমেরিন—দ্রুত কনিংটাওয়ারের ডালা বন্ধ করবার মুখেই একটি মেশিনগানের গুলি এসে বিদ্ধ হয় সোমারের কপালে। তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে সে। সাবমেরিন ডুবে পালায়।

পরদিন ভেসে উঠে, সোমারের মৃতদেহকে যথোচিত সামরিক মর্যাদায় সলিল সমাধি দেওয়া হয়।

দেশে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়। সেখানকার আদেশ অনুসারে সহকারী স্লুট্জে কমাণ্ডের ভার নেয়। সোমারের মত বিচার বুদ্ধি বা কর্মদক্ষতা এর ছিল না। এ ছিল খানিকটা বদরাগী গোঁয়ার ধরনের। প্রথম যুগের হিটলার ভক্ত নাৎসী সৈনিক।

যেহেতু ডোরেনিটজ তাকে সরাসরি কোন আদেশ দেয় নি সুতরাং সে মিত্রপক্ষীয় জাহাজ 'আক্রমণ চলবে না' এ আদেশ মানলো না! টর্পেডো করে বসলো মার্কিন নিরীহ কয়লাবাহী জাহাজটিকে।

গ্রোভ পয়েণ্ট ব্ল্যাক আইল্যাণ্ডের পাঁচ মাইল দূরে আঁচ পাওয়া গেল সাবমেরিনটির। অতি অগভীর সমুদ্র, মাত্র ১৩০ ফিট। প্রচণ্ড সব ডেপথচার্জ ছাড়া হতে লাগলো 'অ্যাথারটন' থেকে—কিছু মারাত্মক হেজহগও ছাড়া হল। আর নিস্তার নেই। এগারটা সাঁইত্রিশ মিনেটে দেখা গেল কতগুলো জঞ্জাল ও তেল ভেসে উঠেছে জলের উপরে। কিন্তু তবুও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। ইতিপূর্বেও ধোঁকা দেবার জন্য নাৎসীরা বহুক্ষেত্রে তেল ও ময়লা ভাসিয়ে দিয়েছে মিছিমিছি। সুতরাং অবিশ্রান্ত আরো কটি ডেপথচার্জ ও হেজহগ ছাড়া হল। ঠিক সেই সময় সুদূর জার্মানীতে গোলাগুলি বন্ধ হল-- যুদ্ধ শেষ বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ, এঁদিকে যখন জলের তলা থেকে সাবমেরিনের চার্টটেবিল ও মানুষের দেহ ভেসে উঠতে লাগলো তখনই বোঝা গেল সব শেষ। এতদিনের দুর্ধর্ষ কালান্তক শত্রু এতদিনে খতম হয়েছে। ডুবুরী নামিয়ে একটি মৃতদেহ তুলে আনা হল। ১৯ বছর বয়সের রিচার্ড হফম্যান নামে এক নাবিকের, ডুবুরী জানালো, বিধ্বস্ত সাবমেরিনের মধ্যে এখনও ৪৭টি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

আজও সেই অগভীর জলের তলায় ইউ—৮৫৩ সাবমেরিনটি পড়ে আছে তার অজস্র অর্থ ও নরকঙ্কাল নিয়ে। ইতিমধ্যে বার তিনেক চেষ্টা হয়েছে তোলবার—একবার ওর গায়ে গত করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তা সফল হয় নি।

কিন্তু বর্তমান সমস্যা হল সাবমেরিনটি তুলবে যে, তার প্রকৃত মালিক কে হবে? আমেরিকা, না পশ্চিম জার্মানী? আর যে ডলারগুলি রয়েছে সেগুলি আগাগোড়াই জাল টাকা নয়ত? তাছাড়া ভুতুড়ে অর্থ কেই বা চায়।

হের হেস-এর রোমাঞ্চকর অপহরণ

বিগত বিশ্বযুদ্ধকালীন চরম উত্তেজনাময় সময়ে সর্বাধিক চাঞ্চল্য এনেছিল যে ঘটনা, তা হল হিটলারের চীফ্ ডেপুটি হের রুডলফ হেস-এর অভাবনীয় ইংলণ্ড অবতরণ। হিটলারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এই গুরুত্বপূর্ণ পদের মানুষটি যে ওভাবে শত্রুদেশে চলে যেতে পারে, এটা ছিল তুনিয়ার জনগণের কাছে অকল্পনীয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে একদিন সকলের অজ্ঞাতে হেস একটি বিমান নিয়ে রহস্যজনক এক অভিযানে স্কটল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

সেখানকার আকাশ থেকে সে প্যারাস্যুট নিয়ে নেমে পড়ল ডিউক অফ হ্যামিল্টনের এস্টেটে। আশা ছিল বোধ করি এই অভিজাত ভদ্রলোকটি তাকে চার্চিলের কাছে পৌঁছে দেবে যাতে সে গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা চালাতে পারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

হেস বুঝি নিশ্চিত ছিল যে, চার্চিল তাঁর শান্তি প্রস্তাবে রাজি হবে এবং তার ফলে হিটলার পাবে ইয়োরোপের পূর্ণ কর্তৃত্ব। পরিবর্তে অবশ্য ইংলণ্ডের নিরাপত্তার জন্য তাঁর দেশ গ্যারান্টি দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। সমস্ত আশা নস্যাৎ করে তাকে বন্দী করে রাখা হল টাওয়ার অফ লণ্ডনে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে।

তারপর যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যাবতীয় যুদ্ধাপরাধীর সঙ্গে ওকেও সেখানে হাজির করার পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে স্প্যান-ডাউ নামক কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তুর্গ সদৃশ বার্লিনের এক কারাগারের নাম হল স্পানডাউ।

এ হল ভূমিকা। এবার আমাদের কাহিনী শুরু :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পেছনে ছিল এক উদগ্র যৌবনবতী মেয়ে—নাম তার জারডা ব্রেখ্ট্। এই বিবস্ত্রা নায়িকা বার্লিন থিয়েটার মহলে 'লিলি-লেগ' বা পদ্মচরণা নামে খ্যাতা ছিল। নিজ দেহের বিনিময়ে সে গড়ে তুলেছিল একটি দল। হিটলার-ডেপুটি হের রুডল্ফ্ হেস-কে জেল-মুক্ত করা ছিল এর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন ··

যুবতীটি কথা বলে যাচ্ছিল, কিন্তু কুৎসিত-দর্শন যুবকটির দৃষ্টি যেন মেয়েটির হাঁটুর দিকে আঠার মতো আটকে ছিল। ওর পাশে আরও দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। প্রথমার বয়েস হবে উনিশ কুড়ি, দ্বিতীয়া কঠোর গঠন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক। বক্তৃতারতা মেয়েটির দিকে এরা দু'জন চেয়েছিল। তবে যুবকের দৃষ্টি হাঁটুর দিকে।

—শ্লেচার, যা বলছি তা মন দিয়ে শোন, দীর্ঘ পদসম্পন্না যুবতী প্রায় বিরক্তিভরে বলে ওঠে, আমার মুখের দিকে চেয়ে শোন।

কিন্তু যুবকটি মোহমুগ্ধ। মাঝারী দৈর্ঘ্যের মেয়েটির দেহভরে রয়েছে উদগ্র যৌবন, মুখাবয়ব বড়ই মনোরম, বিশেষ করে বেড়াল চক্ষুদ্বয় যেন সম্মোহন জানে, মারাত্মক চাউনি।

মেয়েটির নাম জারডা ব্রেখ্ট। বার্লিনের থিয়েটার যাওয়া জনসাধারণের কাছে সে 'ফ্রলিন লিলি-লেগ' বা পদ্মচরণা মেয়ে নামেই সমধিক প্রখ্যাতা। কটিদেশ থেকে পায়ের পাতা অবধি গড়ন তার অনন্যসাধারণ, রেশমমসৃণ সে পদদ্বয় দেখে রসিকজনেরা মুগ্ধ হয়। ওর নাচগান শুনতে ছাত্র, নাবিক, ধনী ব্যবসায়ী থেকে গুণ্ডাবদমাশরা পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে থিয়েটারে।

সেই জারডা গম্ভীরভাবে যুবকটিকে বলে চলেছে, এটা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র, দাম দু'হাজার মার্কের ওপর। তোমার জানলা থেকে ঐ স্পানডাউ কারাগারের সব কিছু লক্ষ্য করবে এর সাহায্যে। দেখ, জেলের ব্যায়াম-উদ্যানে এই মুহূর্তে কত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, দাঁড়াও, ফোকাস করে দেখি তো, আমাদের ডেপুটি ফুয়েরার ওদের মধ্যে আছেন কি না। মেয়েটির কণ্ঠে যেন শ্রদ্ধাভাব এল ডেপুটির কথা বলতে গিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তো আছেন তিনি, নাও চেয়ে দেখ।

অনুপায় হয়ে প্রায় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই শ্লেচার মেয়েটির পা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো দূরবীক্ষণের দর্শন-মুখে। শক্তিশালী লেন্স অদূরের সমস্ত কারাগার যেন চোখের কোলে প্রতিভাত হল। বিশ্বের 'সবচে' নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমন্বিত কারাগার এটি। চার মিত্রপক্ষের

বিপুল অর্থব্যয়ে ও তিনশতাধিক কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয় এই দুর্ভেদ্য পাষাণপ্রাচীর ঘেরা কারাগার। এখানেই আটক আছে গুরুত্ব-পূর্ণ তিন জন জার্মান যুদ্ধাপরাধী। রুডল্‌ফ্‌ হেস, নাৎসী যুব আন্দোলনেব নেতা বলডুর ভন শিরাখ আর হিটলারের অস্ত্র-বিষয়ক মন্ত্রী অ্যালবার্ট স্পিরার।

শ্লেচারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তো হের হেস। মনে পড়ে বিশাল বিশাল জনসভায় হিটলারের সঙ্গে থাকতেন তিনি। কি মহিমময় পুরুষসিংহ ছিলেন তিনি। উঃ আজ তাঁর কি দুরবস্থাই না হয়েছে!

—দুঃখ করো না শ্লেচার, জারডা দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে, আবার তিনি সিংহ হবেন। ভাবো একবার ওঁকে যদি মুক্ত করা যায়, ওঁর ভক্ত আমাদের মত দুনিয়ায় মানুষ কি খুশীই না হবে। ভাবো যে, ইনিই হলেন আমাদের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। ইনি যদিও এখন বৃদ্ধ রুগ্ন কিছুটা বা মস্তিষ্কবিকৃত, তবু ইনি বাইরে এলে সাংঘাতিক অনুপ্রেরণা পাব আমরা। মনে হবে যেন স্বয়ং ফুয়েরারের পদচ্ছায়ায় বসেই আমরা কাজ করছি।

শ্লেচার দূরবীক্ষণের কাঁচে দেখলো, একজন রুগ্ন জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ মাথা নিচু করে পিঠে দু'হাত রেখে ধীরে পদক্ষেপে 'সেল'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে, চোখ নেমে গেছে, কালো চুল প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। যেন এক ভগ্ন-হৃদয় চলেছে নিরুদ্দিষ্ট যাত্রায়, উদ্যমহীন নিঃসঙ্গ।

পদ্মচরণা মেয়ে বললে, অবশ্য হের হেস-কে কারাগার থেকে মুক্ত করা সহজ কাজ নয়। শুধু উদ্ভাবনী শক্তি, চতুর পরিকল্পনার দ্বারাই তা সম্ভব। সাফল্যলাভ করতে গেলে আমাদের সকলকে মরণপণ করে কাজ করে যেতে হবে। হের হেসকে আমরা মুক্ত করবই করব।

শ্লেচার মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে সেই চরণ-চিহ্নিত হল। জারড়ার একনিষ্ঠ ভক্ত সে। যুদ্ধকালে সে ছিল রাজমিস্ত্রী। পুনরায় সে কারাগারের দিকে চাইল।

জিব্রাণ্টারের মতো এক ঝাঁক বিল্ডিং, ষোড়শ শতাব্দীতে যুদ্ধপ্রিয় টিউটনদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। দুর্গের মত অনেকটা আক্রমণ-কারীদের এর ভেতর থেকে বাধা দেবার মত করেই এই প্রস্তর নির্মিত ঘননিবিষ্ট অট্টালিকাগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীরা একে ভয়াবহ নির্যাতনাগার রূপে রূপান্তরিত করে! ইহুদি, অসহযোগী ধর্মযাজক, জিপসী এবং হিটলার-বিরোধী গুপ্ত দলদের শত সহস্র নরনারীর মর্মান্তিক আর্তনাদে এ নির্যাতনাগারের প্রতিটি দেওয়াল এককালে প্রকম্পিত হয়েছে।

বর্তমানে সেটাকে কিছু অদল-বদল করে হয়েছে কারাগার। ভেতরকার ব্লককে চতুর্দিক বন্ধ করে রাখা হয়েছে বাঘা যুদ্ধ অপরাধী-ত্রয়কে। সুউচ্চ দেওয়াল, তাতে কাঁচের টুকরো বসানো, তারও উপরে ইস্পাতের জালের বেড়া। যাতে কয়েদীরা পরস্পর আলাপ না করতে পারে সে জন্য একটি করে সেল খালি রেখে রেখে ওদের রাখা হয়েছে। দিবারাত্র পনের মিনিট অন্তর গার্ডরা দেখে যাচ্ছে কয়েদীদের।

জারডার কণ্ঠ তিক্ত শোনালো যখন সে বললে, স্প্যানডাউ কারাগারের কোন পার্শ্ব বা পেছনের দরজা নেই। একটিমাত্র বের হবার পথ সামনে। ইলেকট্রিক চার্জ করা কাঁটা তার চতুর্দিকে ঘেরা, ছুঁলেই মৃত্যু। প্রহরী টাওয়ারে মেশিনগান নিয়ে প্রহরীর কড়া নজর। যেটা বললাম সেটা ছাড়া অন্য সমস্ত প্ল্যানই কেন অচল বুঝতে পারছ! মনে আছে সেবার স্করজেনীর নির্বোধের মত পরিকল্পনার কথা?

ফাসিস্ট দুঃসাহসী অটো স্করজেনী যে যুদ্ধের শেষভাগে মুসোলিনীকে স্বল্পকালের জন্য মুক্ত করেছিল, সে একবার পরিকল্পনা করে দুটো প্লেন নিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে অবতরণ করবে। প্রথম বিমান প্রহরীদের খতম করবে, দ্বিতীয় বিমান হের হেসকে নিয়ে পালাবে। কিন্তু পূর্বাহ্ণেই মিত্রপক্ষের ইনটেলিজেন্স এ ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলে সবাইকে গ্রেপ্তার করে ফেলে। সেই থেকে আরো প্রচুর ব্যয়ে প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কোনদিকেই কোন ষড়যন্ত্রের ফাঁক রাখা হয় নি। সোভিয়েট, ফরাসী, ব্রিটিশ ও

আমেরিকার অফিসাররা যথা সম্ভব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে।

শ্লেচার পুনরায় দূরবীক্ষণে চোখ রাখলে। পাশে দাঁড়ানো উনিশ বছরের মেয়েটির নাম হিলডা কেমার। গ্রাম্য সরল বালিকা। লিলি লেগসের ভক্ত হয়ে যায় নাচ শিখতে এসে। নাৎসীবাদ সম্বন্ধে তার বিশেষ জ্ঞান নেই। জাবডার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশত সে যা বলত তাই করতে মেয়েটি রাজি। দ্বিতীয় বর্ষীয়সী মেয়েছেলেটির নাম ভেরা ফ্লেবহম। নিষ্ঠুর ঘৃণা ভরা দুটি চোখ তার। এককালে নাৎসী বন্দী-শিবিরে কাজ করত। মনের পর মন দাঁতের সোনা সংগ্রহ করেছে মৃত বন্দীদের। তারই কিছু সরিয়ে বার্লিনে এক বাড়ি কিনে ফেলেছে। স্বামী স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। থিয়েটারের ড্রেসারে চাকরি নিয়ে জারডার সঙ্গে পরিচয়। নাৎসীরাজ্যের পুনর্জীবনে সবিশেষ বিশ্বাসী।

—তাহলে প্ল্যানটা শোন আরেকবার, জাবডা বলে, প্রথমে মিসেস ফ্লেবহম্ এবং হিলডা কারাগারে চাকরি নেবে। ওদের খুব লোকের অভাব। কোন জার্মান ওখানে চাকরি করতে চায় না ও যায় না। তারপর শ্লেচার তুমি নেবে কারাগারের অভ্যন্তরে প্রহরীর চাকরি। সেল-এর চাবিটি সংগ্রহ হলেই কোন একটা চতুর অজুহাতে হের হেসকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে।

শ্লেচার দেখতে কুৎসিত। কোন মেয়েই তাকে আমল দিত না। থিয়েটার দেখতে গিয়ে পায়ের লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। দিনের পর দিন সামনের সিটের টিকেট কেটে লুব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো সে জারডার দিকে। জারডাও মঞ্চ থেকে ওর কামনাবিধুর দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে।

এক রাতে সাহস সঞ্চয় করে ফেললো শ্লেচার। গ্রীনরুমে ফুল নিয়ে উপস্থিত হল সে। জারডা, কৌতুকভরে এই কুৎসিত ভক্তকে কৃপা করল। নিকটবর্তী এক কাফেতে গিয়ে একসঙ্গে বসে পানভোজনে রাজী হল। পরের রাত, তার পরের রাত, এভাবে অনেক রাত একসঙ্গে হোটেলে খাবার পর ঘনিষ্ঠতার মাত্রা আরেক ধাপ বাড়ল।

—ওটা একটা হাঁদা বিশেষ, হেসে জারডা তার তৎকালীন প্রেমিক কর্নেল ম্যাক্স থরবার্গকে বললে, তবে লোকটার কুকুরের মতো প্রেম-ভালবাসার গোঁ আছে। ওকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে। ওর বোকা-বোকা চেহারা দেখে নিঃসন্দেহে কারাগার অফিসাররা ওকে চাকুরিতে গ্রহণ করবে।

নিস্তব্ধ ঘরে মেয়ে দুটিও যুবকের দিকে চেয়ে, বললে জারডা, কি বল পারবে না ?

নিশ্চয়ই পারব, তিনজনেই সায় দিল, তোমার জন্যে সব কিছু করা সম্ভব।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে একদিন দেখা গল মিত্রপক্ষের চার দলীয় অফিসারদের কারাগারের অফিস কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা বসেছে। মার্কিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস এণ্ডারসন বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, একটি উদ্বেগজনক সংবাদ আছে। আমাদের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও লণ্ড্রির এক আলমারির মধ্য থেকে এক শিশি কালান্তক বিষ বেরিয়েছে।

রাশিয়ার কর্নেল ভ্যাসিলি ইলিয়েভিচ বললেন, যে ভাবেই হোক এটা আনা হয়েছে ভেতরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ কয়েদীর ব্যবহারের জন্য এটা আনা হয়েছে।

এণ্ডারসন বললেন, সেটাই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমি আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমাদের মিলিটারী ইন্টিলিজেন্সের মেজর উড্রাফকে ডেকে পাঠিয়েছি। তিনি এদেশীয়দের মতই জার্মান ভাষা বলতে পারদর্শী। তিনি হয়ত এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে সমর্থ হবেন।

ইংলণ্ডের জেনারেল রোনাল্ড হোমস্ পার্কার এবং ফরাসী ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্কোইস এণ্ডার্স্ কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। সুন্দরদেহী উড্রাফ এসে প্রবেশ করলেন।

উড্রাফ সকলকে বললেন, আমার মনে হয় না ঐ তিন যুদ্ধবন্দীর

প্রয়োজনে উক্ত বিষ আনা হয়েছে। যদি আত্মহত্যা করবার ইচ্ছেই থাকত তাহলে ঐ তিনজনের যে কোন ব্যক্তি বহু পূর্বেই তা করতে পারত। এখানে তাঁরা চৌদ্দ বছর ধরে আছে। মরবার ইচ্ছে থাকলে এত বছর কেউ বেঁচে থাকে না।

—কিন্তু কারুর না কারুর জন্যে তো বিষ আনা হয়েছে এটা তো ঠিক, অধৈর্য হয়ে ফরাসী অফিসার বললেন, আমার মনে হয় এটা একটা নরহত্যার পরিকল্পনা।

—আমার তা মনে হয় না, উড্রাফ প্রতিবাদ করলেন, আমার বিশ্বাস করাগারের ভেতরকার কেউ কোন জঘন্য চক্রান্তের প্রচেষ্টায় আছে। যদি সেই অজ্ঞাত চক্রান্তে সাফল্যলাভ করে তাহলে বিষ কাজে লাগবে না কিন্তু বিফল হলেই হয়ত সে দ্রুত মরণালিঙ্গন করবে ঐ প্রুসিক এসিড নামক মারাত্মক বিষ দিয়ে। ধরা যাক চক্রান্তকারী কেউ আমাদের জেলের মধ্যেই আছে,হয়ত সে গার্ড হতে পারে, রান্নার লোক হতে পারে, কোন ধোপানী হতে পারে বা কোন জেনিটারও হতে পারে। সে যে-ই হোক, কোন একজন যুদ্ধবন্দীকে সে মুক্ত করবার ফিকিরে আছে। মনে হয় হের হেসকেই মুক্ত করতে চায় সে। সফল না হলে, আইনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সেই অজ্ঞাত চক্রান্তকারী বিষ সংগ্রহ করে রেখেছে। আপানাদের বোধকরি স্মরণ আছে যে, গোয়েরিং প্রভৃতি নির্বাচিত বন্দীগণ একই পন্থা অবলম্বন করেছে ।

জেনারেল এণ্ডারসন কিছুটা চিন্তা করে তারপর বলে উঠলেন, আগামীকাল থেকে আমাদের একজন নতুন জেনিটার চাকরিতে ঢুকবে। তার নাম হবে এরিখ লেটনার। কেবলমাত্র আমরা চারজনেই তাকে জানব মেজর উড্রাফ বলে।

তিন নম্বর সেল-এর চীফ নাইট গার্ড আঁন্দ্রে মোরেইন যত্ন সহকারে নতুন জেনিটারকে মধ্যযুগীয় প্রস্তর নির্মিত কারাভ্যন্তরে তিনজন যুদ্ধবন্দীর সেলগুলি চিনিয়ে দিচ্ছিল।

—ঐ যে বসে চিঠি লিখছে ঐ হল রুডলফ হেস। এককালে

হিটলারের ডেপুটি ছিল লোকটা। থার্ড রাইখে হিটলারের পরেই নেতৃত্ব দেবার কথা ছিল ওর। অতি জঘন্য লোক। আমি ওদের বন্দী শিবিরে তিন বছর ছিলাম। এই নিষ্ঠুর লোকটা আমাদের প্রতি জানোয়ারের চেয়েও অধম ব্যবহার করেছে। এটা মানুষের বাচ্চা নয়।

জো উড্রাফ সবুজ-পোশাক ও লম্বা টুপি পরেছে। মোরেইন ও অন্যান্য গার্ডরা জানে এ লোকটা আগে শ্রমিক ছিল, বর্তমানে ভাল মাইনের জন্য জেনিটারের কাজ নিয়েছে।

মার্কিন ইণ্টেলিজেন্স এজেণ্ট অল্প আলোকিত সেলের মধ্যে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেন: এই সেই কুখ্যাত হেস। ভালভাবে চেয়ে দেখলেন গুরুত্বপূর্ণ বন্দীকে।

মোরেইন বললে, কোন কোন জেলের ডাক্তার রায় দিয়েছেন হেস-এর নাকি মস্তিষ্কবিকৃত। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। লোকটা বদমাশের জাসু। শৃগালের মত শয়তান ও। এ সেলের তিনটে চাবির মধ্যে একটা আমার কাছে। এরকম গুরুদায়িত্বের জন্যে সব সময় আমায় সশঙ্কিত থাকতে হয় ব্রাদার।

—তা তো বটেই। নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক।

এরিখ লেটনার ও গুস্তাভা শ্লেচার নতুন জেনিটার হিসেবে একটি ঘরেই কোয়ার্টার পেয়েছে। ব্যাভেরিয়ান উচ্চারণে আমেরিকানের কথা শুনে শ্লেচার ভাবে ও তার নিজ দেশের লোক। মন খুলে কথাবার্তা কয়। উভয়ের আলোচনা চলে হিটলার, নাৎসী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক হতাশাবাদীদের পক্ষে হেস-এর মূল্য কি ইত্যাদি নানা বিষয়ে। হেসকে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে জনসাধারণের একাংশের উপর তার কি প্রভাব হবে, এ সব নিয়েও দু'জনের নানা আলোচনা চলে।

জেনারেল এণ্ডারসনকে পরে উড্রাফ জানায়, শ্লেচার কিন্তু সাংঘাতিক লোক, সে একজন নাৎসীবাদী। দু'মাস হল চাকরিতে ঢুকেছে। কিন্তু হেস-এর প্রতি দেখলাম খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন। জানি

না ও-ই বিষ এনেছে কিনা। তবে দেখি অনুসন্ধান করে।

শ্লেচারের একটি মাত্র উৎকট শখ। ওর ঘরের দেয়ালে ও একটি এলবামে লিলি-লেগ-এর বহু মনোলোভী চিত্র বর্তমান। তুমি কি লিলি-লেগকে চেন ?

না, তবে শত শত রজনী ওর নাচ গান শুনেছি। আমি একজন অন্ধ ভক্ত ওর। ওর ছবিই আমার কাছে যথেষ্ট।

রোববার ছুটির দিন। উড্রাফ সন্ধ্যায় শহরে বেরিয়ে শ্লচপার্ক থিয়েটারে দেখে বিরাট বিজ্ঞাপন, "অতুলনীয় লিলি-লেগ-এর নবতম নাচগান!" উড্রাফ থাকতে থাকতেই শো ভাঙলো। রাত তখন এগারটা। সবার মুখেই লিলি-লেগ-এর প্রশংসা। সহসা উড্রাফের চক্ষুস্থির হয়ে গেল স্টেজ-ডোরের দিকে নজর পড়ায়। নীল সার্জের সুট পরা শ্লেচার বাহুতে বাহু মিলিয়ে যে মেয়েটাকে নিয়ে বেরুচ্ছে সে আর কেউ নয় স্বয়ং দিলি-লেগ জারডা ব্রেখ্‌ট।

একটা ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠে চালককে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে ওদের গাড়ি অনুসরণ করে চলল উড্রাফ। নানা বড় ও ছোট রাস্তা পার হয়ে 'গ্রাণ্ডকাফে' নামক পানশালায় এসে থামল ওদের গাড়ি। উড্রাফ রইল কিছু দূরে অন্ধকার ট্যাক্সিতে বসে। ওরা নেমে গেল কাফেতে। উড্রাফও নেমে এল অবশেষে। উঁকি দিয়ে দেখলো কাফের মধ্যে একটা টেবিলে গিয়ে ওরা বসল। সেখানে একটি অল্পবয়স্কা ও একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক পূর্বাহ্ণেই বসে অপেক্ষা করছিল। আরে! এদের যে চেনা মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, এরাও তো স্পানডাউ-এর কর্মচারী। তরুণীটি কিচেন হেল্পার বা ওয়েট্রেসের কাজ করে আর বর্ষীয়সী নিযুক্ত আছে লণ্ড্রিতে।

উড্রাফ গভীর ভাবে চিন্তা করে কতগুলি অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছল। জেনারেল এণ্ডারসনকে অবিলম্বে সংবাদ দিল। সব কিছু বিবরণের পর বললেন, অদ্ভুত যোগাযোগ। জারডার সঙ্গে শ্লেচারের ও দুটি কারাগার কর্মী মেয়ের সখ্যতা বড়ই সন্দেহজনক।

মেয়ে দুটির ফাইল ঘেঁটে দেখা হল। দেখা গেল এক সপ্তাহের

মধ্যেই মেয়ে দুটি ও প্লেচার কারাগারে কর্মী হিসেবে চাকুরি নিয়েছে।

—আপনি নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন ব্যাপারটা ?

—তা ফেলেছি, উড্রাফ বললেন, আমার মনে হয় এই তিনজন নরনারী, জারডার চক্রান্তে হেসকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টায় কারাগারে প্রবেশ করেছে। তার প্রমাণ ভেতরে বিষের শিশি আনা এবং লণ্ড্রির আলমারিতে রাখা। ফ্লেবহমের কাছে ঐ আলমারির চাবি রয়েছে। ঐ স্ত্রীলোকটিই ওখানে বিষ লুকিয়ে রেখেছে। হেস-অপহরণকারী দলের পাণ্ডা হিসেবে প্লেচার যদি অকৃতকার্য হয় তো সে ঐ বিষ খেয়ে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। আঁদ্রে মোরেইনের হাতে তিন নম্বর সেল-এর একটি চাবি আছে। বাকি দুটি আছে অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদ্বয়ের হাতে। আট বছর ধরে মোরেইন এ চাকরি করছে। ওর রেকর্ডে কোন সন্দেহজনক কার্যকলাপ নেই। আমার মনে হয় ও এ চক্রান্তে লিপ্ত নয়। এখন ওর হাত থেকে সেল-এর চাবি না পেলে ঐ দলের চক্রান্ত সফল হবে না।

রাশিয়ান অফিসার বললেন, ঐ তিনজনকে এখুনি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত।

জেনারেল এণ্ডারসন মাথা নাড়লেন, যদি হেসকে উদ্ধার করাই চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে সমূলে বিনষ্ট করাই উচিত। বরখাস্ত করলে এরা বাইরে গিয়ে ফের জারডার সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন পরিকল্পনা নেবার চেষ্টা করবে। জারডা হল প্রাক্তন এন. এস, কর্নেল ম্যাক্স থরবার্গের মিস্ট্রেস। আর উক্ত কর্নেল ছিল বদমাইশ স্করজেনীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত। থরবার্গ এখনো গোপনে নাৎসীবাদ ভক্তদের আড্ডায় যাতায়াত করে। লিলি-লেগ ওর প্রতি আকৃষ্টা। থরবার্গ চাইছে মেয়েটাকে দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করানো।

উড্রাফ বললেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না প্লেচার কিভাবে মোরেইনের কাছ থেকে চাবি হাতাবে কেননা মোরেইনের সঙ্গে প্লেচারের পরিচয়ই নেই।

৪১ বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক মোরেইন লাজুক ধরনের লোক।

বার্লিনের বার থেকে কোন মেয়ে তুলে নিয়ে প্রেম করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যেদিন সে 'ডটমাণ্ডার' না-ক পানশালায় একটি পরিচিত মেয়ে দেখল অর্থাৎ উনিশ বছর বয়স্কা যুবতী হিলডাকে দেখল, ও বেশ খুশীই হয়ে উঠল মনে মনে। হিলডা ঐ বার-এ হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয় নি। সে সন্ধান রেখেছে মোরেইন এই বারটিতেই নিয়মিত যাতায়াত করে। প্লেচারই ওকে সংবাদ দিয়েছে, ছুটির দিনে মোরেইন কোন্ বার, কোন্ পার্ক বা কোন্ কাফেতে সময় কাটায়।

—আরে ফ্রলিন কেমার যে, মোরেইন উল্লসিত হয়ে বলে, তোমার জন্যে বিয়ারের অর্ডার দিই, কেমন ? একটা স্যাণ্ডউইচও বলি ?

—খুব আনন্দ হল আপনাকে দেখে। আপনার মত ভাল লোকের সাক্ষাৎলাভ সৌভাগ্যের, হিলডা মন মোহিনী হেসে বললে, আমি আবার একটু বয়স্ক লোককেই পছন্দ করি সঙ্গী হিসেবে। অল্পবয়সীরা বড় চ্যাংড়া হয়, বড় ডাঁটিয়াল হয়।

মোরেইন একথা শুনে খুশী হল খুবই। আশ্চর্য তো! তার বয়েস চল্লিশ জেনেও, টাক দেখা দিয়েছে দেখেও যে অপছন্দ করে নি এটাই পরম উল্লাসের কথা। উঃ কতদিন মেয়েদের সাহচর্য পায় নি।

পরবর্তী দু' শনিবার একই বার-এ দেখা-সাক্ষাৎ হল। তৃতীয় সাক্ষাৎকালে হিলডার কামনাময় হাসি ও হাবভাব দেখে সাহস সঞ্চয় করে হিলডাকে অনুরোধ করে ফেললো ওর সঙ্গে কোন হোটেল ঘরে যেতে। মৃদু আপত্তির পর হিলডা রাজি হয়ে গেল। এর পর নিঃসঙ্গ নারী।বিহীন মানুষটির রাত বিভোর হয়ে এল হিলডার সাহচর্যে হোটেলের ঘরে।

'নিউ জেটাঙ্গ' নামক প্রখ্যাত পত্রিকা অফিসের পেছনে হোটেল গ্রাসওয়াণ্ডের একটি ঘরে ওরা মিলিত হল। পঞ্চম সাক্ষাৎ হল মোরেইনের ৪২ তম জন্মদিনে। উপহার হিসেবে হিলডা নিয়ে এল এক বোতল ফ্রেঞ্চ ব্র্যাণ্ডি।

আমাদের ভবিষ্যৎ দিনগুলির শুভ কামনায় আজ এ বোতলটি আমরা পান করব।

—ধন্যবাদ ডার্লিং, গদগদ মোরেইন বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বলে, সাধারণত ব্র্যাণ্ডি আমার সয় না। তবু আজ রাতের কথা আলাদা। সবার উপরে তোমার প্রেমের দান, সুতরাং এ বোতলটি আমরা এক্ষুণি শেষ করে ফেলব।

পত্রিকা আফিসের কাছে শ্লেচার এসে হিলডার বাহু জড়িয়ে ধরে তাকে একটা বড় লরীর আড়ালে নিয়ে গেল, ফিসফিসিয়ে বললে, ও পান করেছে কি? ওর চাবির চেনটা পেয়েছ?

—হ্যাঁ পেয়েছি। ও প্রচণ্ড নাক ডাকাচ্ছে এখন। তুমি বোধ হয় কিছু মিশিয়েছ মদের মধ্যে!

শ্লেচার চাবিটি নিয়ে একদলা নরম মোমের মধ্যে তার ছাপ নিয়ে নিল। তারপর হিলডার হাতে চাবির চেন ফেরত দিয়ে বললে, যাও এক্ষুণি গিয়ে ওর পকেটে চাবিটা রেখে দাও এবং ওর সঙ্গেই থাকো। যদি ওর শরীর খুব খারাপ হয়, সেবা শুশ্রূষা কোরো, ভাল ব্যবহার কোরো। ওকে বুঝতে দিও না যে মদের মধ্যে কিছু মেশানো ছিল।

শ্লেচার চলে যেতে, বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে জো উড্রাফ তাকে অনুসরণ করে গেল কামারের দোকান পর্যন্ত। শ্লেচার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না সে। কাছেই এক পাবলিক ফোন থেকে জেনারেল এণ্ডারসনকে ফোন করলো, আমি 'এরিখ লেটনার' কথা বলছি জেনারেল, উড্রাফ নিম্নকণ্ঠে বললে, আমাদের দ্রুত কার্য করার সময় এসে গেছে। কোথায় এবং কি ভাবে তা করতে হবে তাও স্থির করে ফেলেছি।

স্প্যানডাউ কারাগারে বন্দীত্রয়ের মধ্যে সবচেয়ে কুঁড়ে লোক হল রুডলফ হেস। সে নিজ অসুস্থতার অজুহাতে কদাচিৎ সেল পরিষ্কার করে। বেশীরভাগ সময়ই বসে থাকে, পড়ে বা জানলার বাইরে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐ কারাগারে বন্দীদের নামে চেনে না কেউ, নম্বরে চেনে। ডেপুটি ফুয়েরার চেয়েছিল তার হবে নাম্বার ওয়ান। তদুত্তরে কর্তৃপক্ষ ওকে নাম্বার থ্রি রূপে চিহ্নিত করেছে।

লম্বা করিডোরের অপর প্রান্তে 'তিন নম্বরের' দিকে তাকিয়েছিল উড্রাফ। হেস তখন শুয়েছিল যথারীতি। রাত তখন তিনটে বেজে পাঁচ। গার্ড মোরেইন পনের মিনিট পূর্বে তার বন্দীকে চেক করে গেছে। চারদিকের পরিবেশ যথাযথ। দুটো কম্বলের ওপর শুয়ে হেস প্রবল নাক ডাকাচ্ছিল। উড্রাফের মনে হল হেস জেগে থেকে ঘুমের ভান করছে না তো? হয়ত সে অপেক্ষা করছে। হয়ত তাকে তার মুক্তির চক্রান্তের কথা আগেই জানানো হয়েছে।

নিস্তব্ধ রাত। নিস্তব্ধ সময় অতিবাহিত হচ্ছে পলে পলে। গার্ড মোরেইন আবার এল, সেলের মধ্যে টর্চ ফেললো। নাক ডাকা তেমনি চলছে। মোরেইন ফের চলে গেল।

উড্রাফের পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। এই লুক্কায়িত স্থানে গত দু'রাত্রিও সে জেগে কাটিয়েছে। কিন্তু কিছুই ঘটে নি। তবু তাকে অপেক্ষা করে যেতে হবেই। এ ছাড়া উপায় নেই...

সহসা সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। লম্বা করিডোরের অদূরে, ম্লান আলোতে একটি ছায়া-মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে মূর্তি এগিয়ে আসছে। উড্রাফের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। হাতের মধ্যে পিস্তলটিকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে নিলো। হলদে মিটমিটে আলোয় মূর্তিটি আসতে দেখা গেল সে গুস্তাভ শ্লেচার। লোকটার বগলে কতগুলি পোশাক। উড্রাফ দেখল সেগুলি নারীর পোশাক, স্লাক্‌স, ব্লাউজ, একটি টুপি ও রেইন-কোট। এগুলো শ্লেচার কারগারের ভেতরে আনলো কি করে? তখনই উড্রাফের নজরে পড়লো কি করে এনেছে। করিডোরের সীমান্তের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে জারডা ব্রেখ্‌ট। জারডা সেই মুহূর্তে ইউনিফর্ম পরছিল। তাহলে জারডাই নিজ পোশাক খুলে দিয়েছে হেসকে পরাবার জন্য!

উড্রাফ নিশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে দেখছে। শ্লেচার সেল-এর কাছে এগিয়ে গেল। চাবি ঢোকাতে শব্দে হেস জেগে বলে উঠল, কে কে ওখানে? কি আরেকবার বিরক্তিকর ইন্সপেকসন নাকি?

—স্ স্ স্, ডেপুটি ফুয়েরার। আমি আপনার 'বন্ধু', আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি, ফিসফিসিয়ে বললে শ্লেচার।

উড্রাফ লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল শ্লেচারেব দিকে, ধরতে গেল ওকে জাপটে। ধরে যখন সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠল, প্রবল ধস্তা-ধস্তি করে শ্লেচার নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে করিডোর দিয়ে পালিয়ে গেল। জারডা তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

উড্রাফের চীৎকারে আতঙ্কিত হয়ে মোরেইন ছুটে এল করিডোরের অপর প্রান্তে। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল তার পলায়নরত শ্লেচারের সঙ্গে। দু'জনে ধস্তাধস্তি হতে লাগল। উড্রাফ পাছে মোরেইনের গায়ে লাগে তাই পিস্তল চালাতেও পারল না। দৌড়ে এগিয়ে গেল সে দিকে।

আসামী এবারেও নিজেকে মুক্ত করে ছুটলো ডানদিকের করি-ডোর দিয়ে। উড্রাফ প্রচণ্ড লাফ দিয়ে শ্লেচারকে ধরতে গেল। শ্লেচার মরিয়া হয়ে বিদ্যুৎগতিতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে একটা ক্ষয়ে যাওয়া পাথরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়লো সিঁড়িতে—মাথা গিয়ে আঘাত করল পাষাণের তৈরি সিঁড়ির ধাপে, তারপর ঠোক্কর খেতে খেতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্তাক্ত দেহটা। উড্রাফ যখন কাছে পৌঁছল, শ্লেচারের তখন জ্ঞান নেই। পাথরের ধাপে লেগে মাথা ভেঙে থেঁতলে গেছে। ডাক্তারদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শ্লেচার ঘণ্টা ছয়েক বাদে মারা যায়। কারাগার তল্লাসী করে কিন্তু লিলি-লেগ জারডার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল এস. এস. কর্নেল ম্যাক্স থরবার্গকে গ্রেপ্তার করা হল, সঙ্গে সঙ্গে জারডাকেও। কর্নেলের ২০ বছর কারাদণ্ড হল।

ভেরা ফ্লেবহম্-এর সাত বছর হল, সে এখনও জেল খাটছে। সরলমতি নিষ্পাপ বলে হিলডাকে রেহাই দেওয়া হয়। চাবি হারানোর অপরাধে মোরেইনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল। আর লিলি-লেগ মোহময়ী জারডার হয়েছিল দশ বছর কারাদণ্ড। কিন্তু

দু' বছর দণ্ডভোগের পর ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে মূত্রাশয়ের পীড়ায় সে জেলের মধ্যেই মারা যায়।

সেল নাম্বার থ্রি-র করিডোরে আর মৃদু হলদে আলো জ্বলে না। সেখানে বসানো হয়েছে চোখ ঝলসানো এক ফ্লাড লাইট। হেস-এর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেটি সারারাত জ্বলে। হের হেসকে পাহারা দেবার গার্ডেরা প্রতি ৬ সপ্তাহ অন্তর বদলী হয়ে যায়। আর নিরাপত্তার ব্যবস্থাও এতটুকু শিথিল হয় নি। কেননা কর্তৃপক্ষরা এ বিষয়ে খুবই সচেতন যে, যতদিন ইয়োরোপে হিটলার-ভক্ত কিছু সংখ্যক জনতাও বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত হিটলারের পরবর্তী নেতা হের' হেসকে কারামুক্ত করবার জন্য নব-নব চক্রান্ত হতেই থাকবে।